ঝিলে-জঙ্গলে

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

বাঘটার চোখ দুটো আরো তীব্র হয়ে জ্বলে উঠলো, রাগে গর্ গর্
করে সে এগিয়ে এলো···
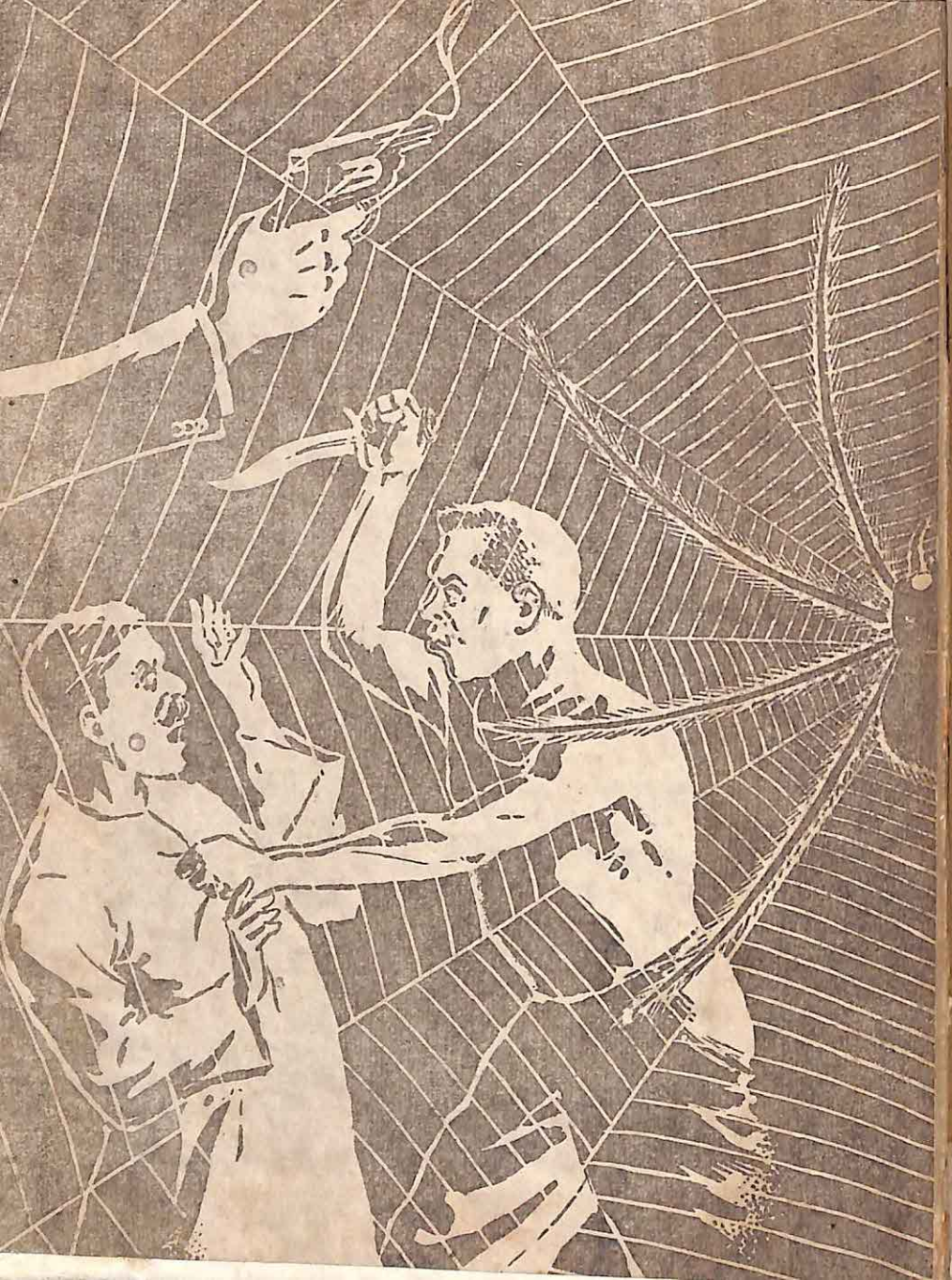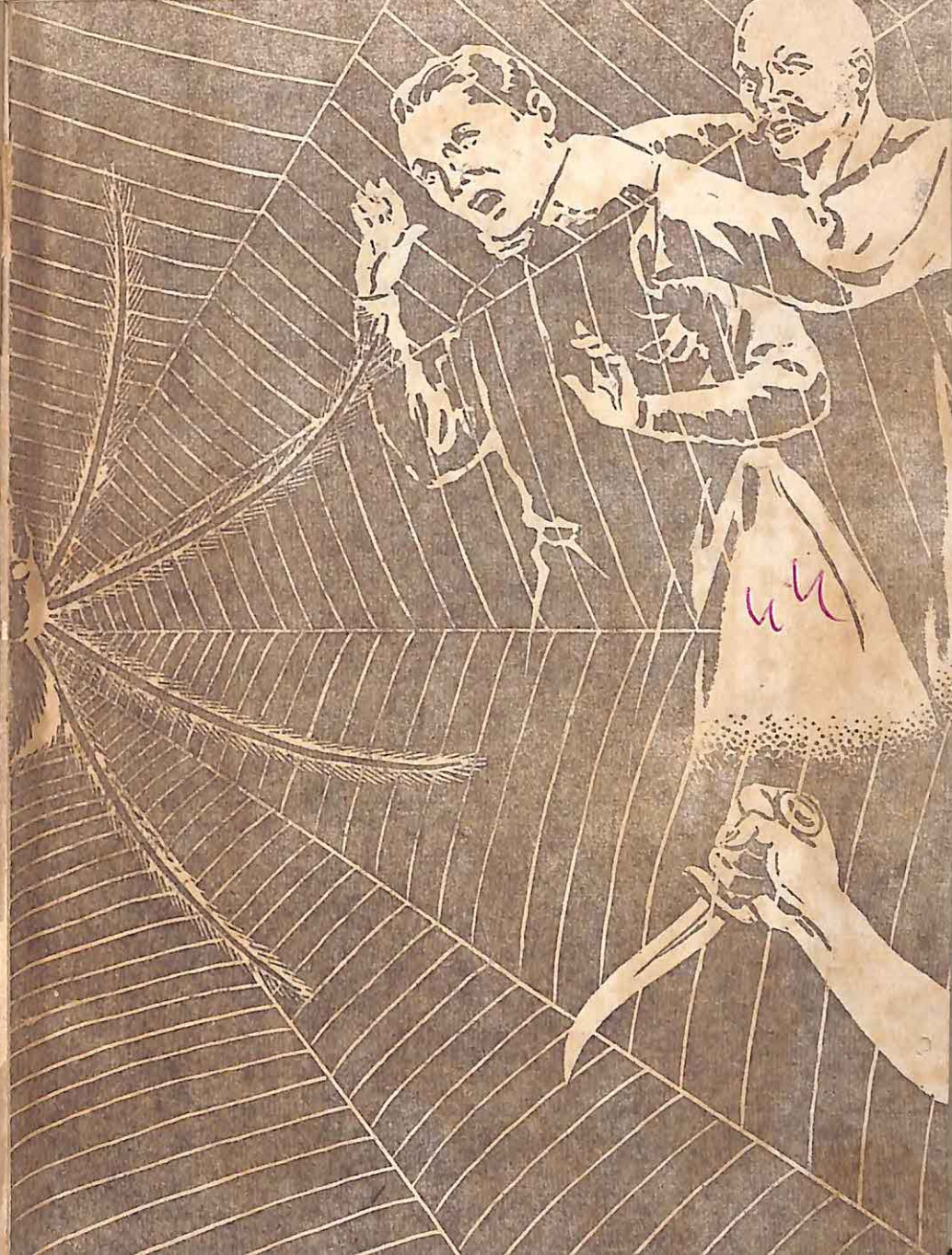
পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক প্রাইজ ও লাইব্রেরীর জন্য অনুমোদিত

নূতন সংস্করণ—অক্টোবর, ১৯৮০।

বনে জঙ্গলে

ব্ল্যাক অ্যারো, দেশ-বিদেশের হীরে-জহরত, অতীতের পৃথিবী প্রভৃতি পুস্তক প্রণেতা

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

প্রণীত

দেব সাহিত্য কুটীর

প্রকাশ করেছেন—
শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার
দেব সাহিত্য-কুটীর প্রাইভেট্ লিমিটেড,
২১, ঝামাপুকুর লেন,
কলিকাতা—৯

অক্টোবর
১৯৮০
৮

ছেপেছেন—
অমলকৃষ্ণ কুমার
উমাশঙ্কর প্রেস
১২, গৌরমোহন মুখার্জী স্ট্রীট,
কলিকাতা– ৬

দাম—
টা. ৪·০০

উপহার

দু' একটি কথা

গল্পটি শিকারের। কিন্তু এতে কেবল শিকারীর দুঃসাহসিকতার কথাই নেই, বনভূমির ভয়াল ও সুন্দর মূর্ত্তিও তার সঙ্গে আঁকবার চেষ্টা করেছি। হিংস্রতার জন্যে যারা মানুষের শত্রু বলে কুখ্যাতি অর্জ্জন করেছে, সহজ অবস্থায় তারা কত শান্ত! কিন্তু চিড়িয়াখানার জন্তু-জানোয়ারের মত নির্জ্জীব নয়।

বইখানি যদি ছেলেদের ভাল লাগে, কারো মনে যদি সাহসের সঞ্চার হয়, তাহলেই আমার লেখা সার্থক।

কলিকাতা
বৈশাখ, ১৩৪১

গ্রন্থকার

ঝিলে-জঙ্গলে

—:০ ❋ ০:—

এক

হাজারীবাগ শহর থেকে বড়্‌কাগাঁও আট-দশ ক্রোশ দূর। তার চারধারে গভীর বন-জঙ্গল। শহর থেকে যে পথটা চড়াই-উৎরাই ভেঙ্গে তার দিকে চলে গেছে, তারও দু'পাশে গভীর বন। দিনমানেও কখন-কখন সে পথে দু'একটা হায়েনা বা ভালুক দেখা যায়। সে জন্যে কোন পথিক সে পথ দিয়ে সচরাচর একলা চলে না।

তখন শীতকাল। একদল শিকারী বড়্‌কাগাঁওয়ের জঙ্গলে শিকারে গেছেন। তাঁদের সঙ্গে বিস্তর লোক-জন। পথের ধারে একটু জায়গা ফাঁকা দেখে তার মধ্যে শিকারীদের তাঁবু পড়েছে। তিনজন শিকারীর একজন বাঙ্গালী, একজন সাহেব, আর একজন যে কোন্ দেশী বলা কঠিন। তাঁর দেহ দীর্ঘ ও বলিষ্ঠ; রং পোড়া লোহার মত। মুখে প্রকাণ্ড এক জোড়া গোঁফ; মাথায় ঘন লম্বা চুল। তাঁকে সকলে "মিঃ ফরেষ্টার" বলে ডাক্‌ত। কেউ-কেউ বলে, তিনি অসমীয়া। খুব সম্ভব তাই-ই।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা শিকার-শেষে, তিন বন্ধুতে তাঁবুতে বসে সেদিনকার

শিকারের বিষয় গল্প করছেন। তিনজনের সমুখে তিন মগ্ গরম চা ও হাতে জ্বলন্ত চুরুট। বাবুর্চ্চিখানা থেকে হরিণের মাংস-ভাজার চমৎকার গন্ধ ভেসে আসছে।

সাহেব শিকারী মিঃ ব্রেকার বল্‌লেন,—"মিঃ ফরেষ্টার, আপনার সাহস অসাধারণ। কিন্তু আজ যে-ভাবে নিজের জীবন বিপন্ন করে-ছিলেন, তা দেখে আমার ভয় হয়, আপনি হয়ত কোন্‌দিন বাঘের মুখে প্রাণ দেবেন—"

বাঙালী শিকারী ধীরেনবাবু সাহেবের কথায় সায় দিয়ে বল্‌লেন,—"তা সত্যি। বাঘটা যে ভাবে ওঁর ঘাড়ের ওপর লাফিয়ে পড়েছিল, তাতে মনে হয়েছিল, উনি বুঝি এই গেলেন! কিন্তু কি আশ্চর্য্য সাহস ও ক্ষিপ্রকারিতা! পাহাড়ের মত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে উনি রাইফেলটা সড়্‌কীর মত হেলিয়ে ধরে কেমন ধীর ভাবে গুলি করলেন! ব্যস্! ঐ একগুলিতেই বাছাধনের হৃৎপিণ্ড চৌচির!"

মিঃ ফরেষ্টার চুরুটে একটা লম্বা টান দিয়ে কেবল একটু হাসলেন।

ধীরেনবাবু বললেন,—"আচ্ছা, মিঃ ফরেষ্টার, আপনার তখন একটুও ভয় করে নি?"

"ভয়?—শুনুন, আমার জীবনের ঘটনা। একটা দুটো নয়, এমন অনেক ঘটেছে—"

ঠিক তখনই কিছুদূরে বনের অন্ধকারের মধ্য থেকে একটা হায়না হঠাৎ হা-হা শব্দে হেসে উঠ্‌ল। মিঃ ফরেষ্টার সেই দিকপানে একবার জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে বল্‌তে সুরু করলেন—

"তখন আমার বয়স পঁচিশ কি ছাব্বিশ বছর। আমি আসামে থাকি। ইচ্ছে হ'ল, কিছুকাল একা পাহাড়ে-পর্ব্বতে বনে-জঙ্গলে ঘুরে

বেড়াব। সঙ্গে থাকবে শিকারের জন্যে অস্ত্র-শস্ত্র আর খুব দরকারী দু-চারটে জিনিষ। কিন্তু আমাদের বহু দিনের চাকর শক্তিধর আমার সে সঙ্কল্পে বাধা দিলে। সে বল্‌লে,—'আমিও যাব।' তারও কেউ কোথাও ছিল না। প্রথমটা তাকে নানা রকমে নিরস্ত করবার চেষ্টা করলুম। কিন্তু কিছুতেই না পেরে পরিশেষে তাকে সঙ্গে নিয়ে একদিন ভোরে বেরিয়ে পড়লুম জঙ্গলের পথে। তখন থেকে সেই হ'ল আমার সঙ্গী ও পরম বন্ধু।" বল্‌তে বল্‌তে মিঃ ফরেষ্টারের গম্ভীর স্বর একটু কোমল ও জ্বলন্ত চোখ দুটো ম্লান হ'য়ে পড়্‌ল। কিন্তু সে ভাব ক্ষণিকের জন্য। তারপরই আবার পূর্ব্বের মত স্বরে বল্‌তে লাগলেন—

"আমরা চল্‌তে লাগ্‌লুম হিমালয়ের দিকে। সচরাচর যে পথ দিয়ে লোক চলাচল করে, সে পথ আমরা যথাসম্ভব এড়িয়ে বনের মধ্যে একটা সরু পথ ধরে চলেছি। হয়ত শুনে থাকবেন, প্রচুর বৃষ্টি হওয়ার দরুণ ও-অঞ্চলের বন খুব ঘন ও গাছপালা খুব সতেজ।

তখন সকাল হ'লেও বনের তলায় বেশ একটু অন্ধকার লেগে ছিল। আমি ছিলুম আগে, শক্তিধর আমার পিছনে। আমার হাতে টোটা-ভরা রাইফেল, শক্তিধরের হাতে একখানি সুতীক্ষ্ণ টাঙ্গি। বনের মধ্য দিয়ে প্রায় ক্রোশ-চার চলে যাবার পর একটা ছোটখাট জলার ধারে গিয়ে আমরা পৌছলুম। জলাটার চারিধারে সুবিশাল শাল প্রভৃতি গাছ ও ঘন ঝোপঝাড়। আমাদের তখন পথশ্রমে ক্লান্তি বোধ হচ্ছিল। সেই জলাটার ধারে একটা শাল-গাছের নীচে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করব বলে তার তলায় ঝোপটার কাছে যেতেই হঠাৎ তার মধ্য থেকে একটা চাপা ক্রুদ্ধ গর্জ্জন উঠ্‌ল। ব্যাপারটা বুঝ্‌তে

কারো একটুও দেরী হ'ল না। শক্তিধর খুব খাটো গলায় বল্‌লে—'বাঘ!'

আমি ঠোঁটে আঙ্গুল দিয়ে তাকে চুপ করে থাকতে ইসারা করে সেইখানেই স্থির হয়ে দাঁড়ালুম। কিন্তু এক মিনিট, দু' মিনিট করে মিনিট-তিনেক সময় কেটে গেল, তবুও বাঘের দেখা নেই! সন্দেহ হ'ল, হয়ত বাঘ নাও হ'তে পারে! দু'-এক পা এগিয়ে ঝোপের গাছপালা একটু ফাঁক করে ভেতরটা এক ঝলক দেখে নেব বলে এগিয়ে যেতেই বাঁ-দিক থেকে খুব চাপা খস্‌খস্ শব্দ উঠ্‌ল। মনে হ'ল, শুক্‌নো পাতার ওপর দিয়ে কি যেন চল্‌ছে! সেদিকে ত্রস্তে ফিরে দেখি, একটা বাঘ! চোরের মত চুপে-চুপে গুঁড়ি মেরে সে আমাদের দিকে আসছে! যে কোন মুহূর্ত্তেই সে আমাদের ঘাড়ের ওপর লাফিয়ে পড়তে পারে।

তখন পালানো ত অসম্ভব। আধ-মিনিট নষ্ট করলেও মৃত্যু নিশ্চিত। আমিও তৎক্ষণাৎ ফিরে দাঁড়িয়ে জানোয়ারটাকে গুলি করলুম। সেও সঙ্গে-সঙ্গে ভয়ঙ্কর গর্জ্জন করে বিপুল বেগে আমাকে আক্রমণ করল। তখন শক্তিধর যে কোথায় ছিল, আমার খেয়াল ছিল না। আমি একপাশে মাত্র হাত-খানেক যেতেই বাঘটা, আমি যেখানটিতে দাঁড়িয়ে ছিলুম ঠিক সেইখানে লাফিয়ে পড়্‌ল। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! জানোয়ারটা আমায় আর আক্রমণ করলে না! হাত-কয়েক দূরে একটা মাঝারী গোছের মোটা শালগাছের গুঁড়ির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার ধাক্কায় ঠিক্‌রে মাটিতে লুটিয়ে পড়্‌ল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ আবার উঠে দাঁড়াল। এবার দেখি গুলির আঘাতে তার দুটো চোখই নষ্ট হয়ে গেছে, কোটর থেকে ঝর্‌ঝর্ ধারায়

রক্ত ঝর্‌ছে—রাগে, যন্ত্রণায় ও রক্তে বাঘটার মুখের চেহারা অতি ভয়ঙ্কর !

এদিকে নীচে এই ব্যাপার চলছে, ওদিকে কিছু দূরে একটা গাছে ঠিক তখনই এক ভয়ঙ্কর কাণ্ড সুরু হ'ল। হঠাৎ সন্‌-সন্‌ শব্দে নিস্তব্ধ বন ভরে উঠ্‌ল। মনে হ'তে লাগ্‌ল যেন দূরে কোথাও মুষলধারে বৃষ্টি নেমেছে। শব্দের সঙ্গে গাছটার ডাল-পালাগুলোও একটু-একটু করে নড়ছে !

চকিতে একবার ওপর পানে তাকিয়ে দেখি, একটা ভালুক ! ভালুকটার সমুখে প্রকাণ্ড একখানি মৌচাক। চাকের মাছিগুলোকে তাড়িয়ে সে মধু খাবার যোগাড় করছিল। ক্রুদ্ধ মাছিগুলো ঝাঁক বেঁধে তার চারপাশে সন্‌-সন্‌ শব্দে উড়ে বেড়াচ্ছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই হয়ত তারা আমাদেরও তাড়া করবে। পিছনে তাকিয়ে দেখি, শক্তিধর হাতের টাঙ্গিখানা বাগিয়ে ধরে আমার কাছেই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এক পা-ও সে নড়ে নি।

মাত্র মিনিট-খানেকের ব্যাপার। বাঘটা ততক্ষণে সম্মুখে আর একটা ঝোপে ঢুকে পড়েছে। আমরা দু'জনে তারই পিছনে ছুটলুম। গোটা-কয়েক মৌমাছিও নীচে নেমে এল কিন্তু আমাদের আক্রমণ করবে কিনা, সে বিষয়ে বোধ হয় মনস্থির করতে না পেরে, আমাদের মাথার ওপরে সন্‌-সন্‌ শব্দে উড়ে বেড়াতে লাগ্‌ল।

পাতার ওপর ও মাটিতে ফোঁটা-ফোঁটা রক্তের দাগ দেখে আমরা বাঘটার সন্ধানে চলতে লাগলুম। যে ঝোপের মধ্যে বাঘটা ঢুকেছিল সেটা সন্তর্পণে সরিয়ে দেখি, বাঘটা সেখানে নেই। রক্তের দাগ সেখান থেকে বেরিয়ে ডানদিকে গেছে। সেদিকেও হাত-পনেরো

গিয়েই দাগগুলো আবার বাঁ-দিক পানে ঘুরেছে! কিন্তু আর বেশী দূরে যেতে হ'ল না। কিছু দূরে একটা গাছের তলায় ঝোপের পাশে বাঘটা কাৎ হয়ে পড়ে ছিল। আমাদের পায়ের শব্দ কানে যেতেই এক হুঙ্কার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। কিন্তু ঐ তার শেষ ডাক! একটি মাত্র গুলিতে তার সব যন্ত্রণার শেষ করে দিলুম।

তারপর শক্তিধরকে বাঘটার ছালখানা ছাড়াতে বলে, সেই ভালুকটার সন্ধানে ছুটলুম।

দুই

"ছুট্‌তে-ছুট্‌তে শুনতে পেলুম, গাছের ডাল-পালা নাড়ার শব্দ হচ্ছে। ক্রুদ্ধ মৌমাছিদের একটানা ঝঙ্কারে স্তব্ধ বন আরও ভয়ঙ্কর বোধ হ'তে লাগ্‌ল। ভালুকটা যে চাকখানা ভেঙ্গে মধু পান সুরু করেছে, এতে একতিলও সন্দেহ রইল না। গাছের নীচে দাঁড়িয়ে ভালুকটাকে মারা সহজ হ'লেও সেখানে যাওয়াটাই তখন বিপজ্জনক। মৌমাছিরা তাহ'লে আমাকে অক্ষত রাখবে না। তবুও আস্তে-আস্তে সেদিকে এগিয়ে যেতে লাগলুম। কিন্তু সোজা পথ ধরলুম না। বরাবর ঝোপের আড়ালে-আড়ালেই থাকবার চেষ্টা করতে লাগ্‌লুম।

এমনিভাবে ঝোপে-ঝোপে প্রায় মিনিট সাত-আট চলবার পর সেই জলাটার ধারে এসে পৌঁছলুম। সেখান থেকে গাছটা বেশ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। মৌমাছিরা ঝাঁক বেঁধে তার ওপরে, নীচে, চারধারে উড়্‌ছে যেন কালো ধোঁয়া! প্রকাণ্ড চাকটার আধখানা ভাঙা, কিন্তু ভালুকটা গাছে নেই। কখন নেমে চলে গেছে! শিকার পালালে কি রকম কষ্ট হয়, আপনারা জানেন। আমার বড়ই আফশোষ হ'তে লাগ্‌ল। কিন্তু উপায় কি? আবার শক্তিধরের কাছে ফিরে চল্‌লুম। মৌমাছিদের ভয়ে এবারও ঝোপ থেকে বার হতে সাহস হ'ল না।"

মিঃ ফরেষ্টারের কথা শেষ হবার সঙ্গে-সঙ্গেই বাবুর্চ্চিরা চীৎকার

করে উঠ্‌ল,—"হুজুর, বাঘ! বাঘ!" তারপরই প্রকাণ্ড একটা বাঘ তাদের তাঁবুর সমুখ দিয়ে অন্ধকারের মধ্যে চলে গেল। এতে শিকারীরা কেউই বিচলিত হ'লেন না। মিঃ ফরেষ্টারের গল্প সমানেই চল্‌তে লাগ্‌ল—

"শক্তিধরের সাহস ছিল আমি জানি। সে যে বাঘ-ভালুকের সঙ্গে টাঙ্গি দিয়ে একা যুদ্ধ করতে পারে, এ আমি জানতাম না। গিয়ে দেখি, মৃত বাঘটার দেহের পাশে একটা ভালুকের সঙ্গে সে লড়াই করছে। তার বাম হাতখানি রক্তাক্ত; ডান হাতে টাঙ্গি চালিয়ে সে ভালুকটার নাক, মাথা ও একখানি থাবা ক্ষত-বিক্ষত করে দিয়েছে। তবু ভালুকটার তেজ কম্‌ছে না। সে উঠে দাঁড়িয়ে তাকে আলিঙ্গনে পিষে ফেলবার চেষ্টা করছে। ফলে শক্তিধর ক্রমে পিছনের দিকে সরে যাচ্ছে। মনে হ'ল, সে পিছনের মোটা গাছটার আড়ালে গিয়ে আত্মরক্ষা করতে চায়। কিন্তু যে ভাবে ভালুকটা ক্ষেপে উঠেছে, তাতে সে শীঘ্রই শক্তিধরকে ধরাশায়ী করবে। অথচ আমি যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলুম, সেখান থেকে গুলি করলে শক্তিধরের গায়ে তা লাগ্‌তে পারে! তবুও হাত-কয়েক এগিয়ে একটা সুবিধামত জায়গায় দাঁড়িয়ে গুলি করবার জন্য রাইফেল তুলতেই শক্তিধরের টাঙ্গিখানা ভালুকটার মাথা দু ফাঁক করে ফেল্লে। জানোয়ারটা একটা কাতর শব্দ করে শক্তিধরের পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়্‌ল। তখন তার আনন্দ দেখে কে? মনে হ'ল, তার আহত হাতখানায় বুঝি একটুও যন্ত্রণা হচ্ছে না!

"সৌভাগ্যবশতঃ তার হাতের কোন শিরা ছিঁড়ে যায় নি। তাড়াতাড়ি সেই জলার আর একধারে তাকে নিয়ে গিয়ে জলে তার

ক্ষত ধুয়ে সঙ্গে যে ঔষধ ছিল, তাই দিয়ে ক্ষতগুলো তখনকার মত বেঁধে দিলুম। তারপর বাঘটার ছালখানা ছাড়িয়ে নিয়ে, মরা ভালুকটাকে সেখানে ফেলে, আমরা বনের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চল্‌লুম! বেলা তখন দুপুর হবে।

"কিন্তু ঐ অবস্থায় শক্তিধরকে আমার সঙ্গে নিতে আর ইচ্ছা হ'ল না। অথচ ফিরে পাঠাতে হ'লে আমারও তার সঙ্গে যাওয়া দরকার। শক্তিধরকে আমার ইচ্ছা জানাতেই সে আমার পা দুটো জড়িয়ে ধরল; বল্লে, 'এতকাল আপনাদের খেয়ে আমি মানুষ। শেষ অবধি আপনার সঙ্গে থাকতেই চাই।' বুঝলুম, সেই ভয়ঙ্কর বনে সে আমাকে একলা ছেড়ে দিতে চায় না। অগত্যা তার ইচ্ছার কাছে আমাকেই হার মানতে হ'ল।

"এদিকে বনটাও ক্রমে গভীর হয়ে উঠ্‌ছে। কাঠুরিয়াদের পায়ে পায়ে যে পথ ঝোপে-ঝাড়ে জেগে উঠেছিল, তা কোথায় মিলিয়ে গেছে! মাঝে-মাঝে বনের মধ্য থেকে এক-একটা শব্দ কানে আসে, কোনটা হরিণের, কোনটা বুনো শূকরের। কিন্তু চোখে কোনটাকেই দেখতে পাই না। সঙ্গে খাবার ও বোতলে জল ছিল; চল্‌তে-চল্‌তে দু'জনে তা খেয়ে নিলুম।

তারপর আরও কিছুদূর চলে গিয়ে বনটা একটু যেন পাত্‌লা হ'ল। কিন্তু দেশটারও চেহারা বদ্‌লে গেল। দূরে-দূরে কালো-কালো পাহাড় দেখা যায়। সম্মুখে ঘন-ঘন চড়াই-উৎরাই। একটা ঝর্‌-ঝর্‌ শব্দও শোনা যেতে লাগ্‌ল। সেই শব্দ লক্ষ্য করে আমরা এগিয়ে চল্‌লুম। ওদিকে বেলাও আর বেশী নেই। দু'জনে বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। কিছুদূর গিয়ে একটা সরু পাহাড়ে' নদীর ধারে পৌঁছলুম।

কিন্তু তার তীরে রাত কাটাবার মত কোন আশ্রয় ছিল না। অনেক খোঁজাখুজির পর কিছু দূরে গাছপালার আড়ালে একতলা সমান উঁচু প্রকাণ্ড একখানা পাথর দেখা গেল। তার মাথাটা বেশ সমতল—দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে হাত চার-পাঁচ হবে। হাত কয়েক নীচে একটি গর্ত্ত, যেন উনান! কিন্তু পাথরখানার গা এমন পিছল যে ওঠা দুঃসাধ্য। কিন্তু পাথরখানার কাছে খয়ের গাছটায় উঠ্‌লে তার ডাল বেয়ে মাথায় পৌছানো যায়। আমি শক্তিধরকে কাঁধে করে গাছের ওপর তুলে দিতে, সে ডাল বেয়ে পাথরখানার ওপরে গিয়ে পৌছল। তারপর একগাছি দড়ি নামিয়ে আমার হ্যাভারস্যাক প্রভৃতি ওপরে তুলে নিলে। চারদিক থেকে কুড়িয়ে এনে কতকগুলো শুক্‌না ডাল-পালা ও একটা ছোট শুক্‌নো গুঁড়ি আগুনের জন্য ওপরে তুলে দিলুম। কিন্তু নদীর ধারে স্নাইপ প্রভৃতি পাখী দেখে আমার তখন ওপরে উঠ্‌তে ইচ্ছা হ'ল না।

নদীর তীর ধরে চল্‌তে-চল্‌তে গোটা-কয়েক স্নাইপ ও বক শিকার করা গেল। তারপর পাথরখানার কাছে যখন ফিরে এলুম, তখন চারদিকে সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এসেছে। ঝিঁঝির ডাকে সারা বন মেতে উঠ্‌ল। শক্তিধর ইতিমধ্যে পাথরের সেই গর্ত্তের মধ্যে ডাল-পালা দিয়ে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিল। আমি সেই গাছটা বেয়ে ওপরে উঠে পড়লুম। তারপর পাখীগুলোকে ছাড়িয়ে সেই আগুনে পুড়িয়ে লবণ ও গোলমরিচের গুঁড়ো মাখিয়ে খেয়ে দু'জনে শুয়ে পড়লুম।

চারদিকে গভীর অন্ধকার। তার মধ্য দিয়ে পাহাড়ে' নদীটা ঝর্‌-ঝর্‌ শব্দে ছুটে চলেছে। মাঝে-মাঝে বাঘের ডাক শোনা যায়।

ভালুকের কবলে শক্তিধর।
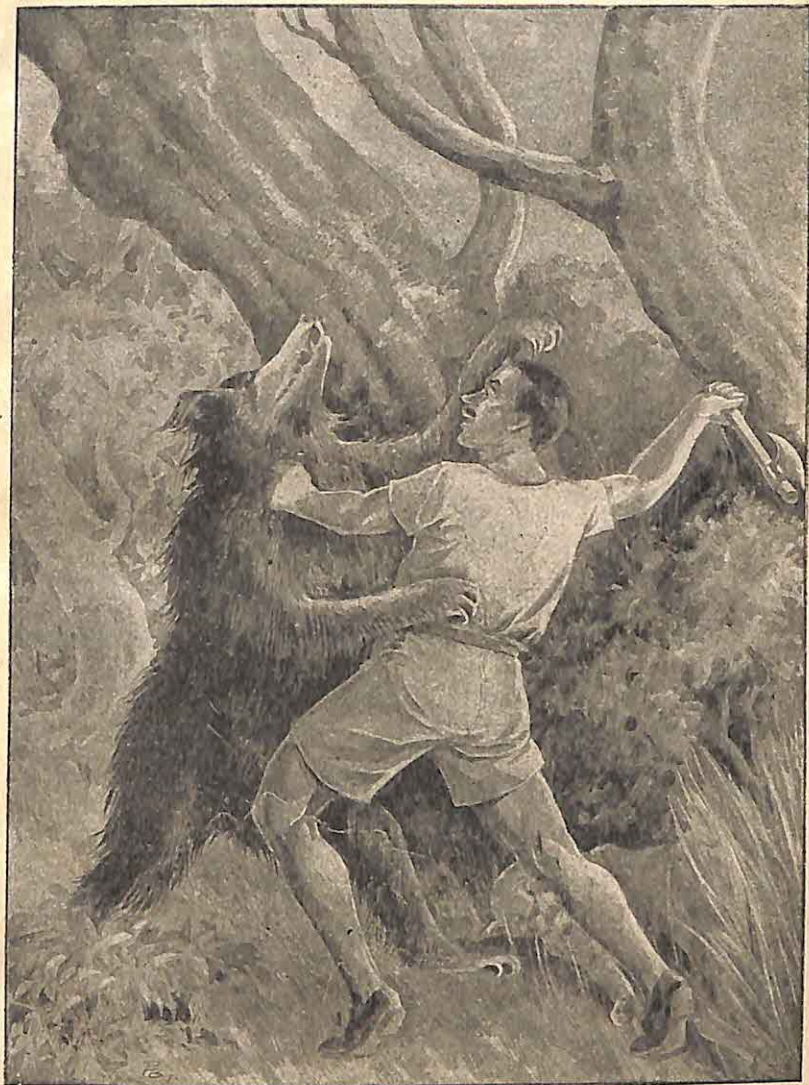
নদীর ধার দিয়ে কে যেন ছুটে পালাতে থাকে! গাছ-পালার মধ্যে হুড়োহুড়ির শব্দ ওঠে। এই সব ব্যাপারে আমার চোখে ঘুম আর আসে না; উঠে বসে সেই জমাট অন্ধকারের মধ্য দিয়ে চারদিকে তাকাতে-তাকাতে দেখি, একটা গাছের তলায় একঝাঁক জোনাকী পিট্-পিট্ করে উড়ছে; মাঝে-মাঝে হঠাৎ ছড়িয়ে পড়ছে, আবার সেই জায়গায় জটলা পাকাচ্ছে।

চোখ দুটো যথাসম্ভব তীক্ষ্ণ করে দেখি, জোনাকীর ঝাঁকের মধ্যে মাটির সঙ্গে প্রায় লেগে পাশাপাশি দু'টুক্রো আগুন! যেন দুটো ভাঁটা!

হঠাৎ সেই আগুনের ভাঁটা দুটো মাটি থেকে হাত-দুই ওপরে উঠ্‌ল। তারপর এপাশ-ওপাশে একটু নড়ল। আবার এক জায়গায় স্থির হ'ল। তৎক্ষণাৎ সে দুটো লক্ষ্য করে আমি রাইফেল তুলতেই জোনাকীগুলোকে ছত্রাকারে ছড়িয়ে, বনের অন্ধকারে তা মিলিয়ে গেল। বহুক্ষণ অপেক্ষা করেও সে দুটো আর দেখতে পেলুম না। কিন্তু মাঝে-মাঝে বাঘের ডাক শোনা যেতে লাগ্‌ল।

তারপর কখন ঘুমিয়ে পড়েছি জান্‌তে পারি নি!

তিন

"পরদিন চারদিক থেকে পাখীর কলরবে ঘুম ভেঙ্গে গেল। চোখ মেলে তাকিয়ে দেখি, পুবদিক ফর্সা হয়ে এসেছে। পশ্চিমাকাশেও অন্ধকার বিশেষ নেই। নদীর ধারে একটা শূকরী নিশ্চিন্ত মনে তার ছানাগুলোর সঙ্গে শিকড় খুঁড়ে-খুঁড়ে খাচ্ছে। দুটো বাচ্চা জলের ধারে ঘোরা-ঘুরি করছে। আমি পাথরখানার ওপর থেকে নামবার উদ্যোগ কর্‌তেই আর এক দিকে চোখ পড়্‌ল। শূকরটার কাছ থেকে কিছুদূরে ঝোপের নীচে একটা চিতাবাঘের মাথা! তার চিত্রিত শরীরটাকে দেখা যায় না। সেটা সে ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে রেখে ছানাগুলোর দিকে জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে আছে।

তার মাথাটাকে প্রথম ঝলকে মনে হয়েছিল পাকা কচুর পাতা। কিন্তু তীক্ষ্ণ দাঁতগুলো ও জ্বলন্ত চোখ দুটো আমার সে ভুল ভেঙ্গে দিলে। বাঘটার মতলব যে কি, তা বুঝ্‌তে দেরী হ'ল না। মনে করলুম, সেই সুযোগে মাথাটা এক গুলিতে ছেঁদা করে দিই! কিন্তু ব্যাপারটা শেষ অবধি কি ঘটে দেখ্‌বার জন্য রাইফেলটা তার দিকে পেতে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়লুম।

বাঘটা খুব আস্তে-আস্তে একেবারে মাটির সঙ্গে মিশে একটু-একটু করে এগিয়ে আস্‌তে লাগল। বাচ্চাগুলো এক ধারে সরে যায়, সেও সেদিকে ফেরে। তারা এক জায়গায় কিছুক্ষণ থাকলে সেই ফাঁকে বাঘটা একটু এগিয়ে আসে। ক্রমে তাকে স্পষ্ট দেখা যেতে লাগ্‌ল— প্রকাণ্ড শরীর। লেজের ডগাটা একটু একটু নড়ছে; চার পায়ের

পেশীগুলো শক্ত হয়ে উঠেছে; গোঁফগুলো খাড়া। আর সাম্‌নের দাঁতগুলো একটু বেরিয়ে পড়েছে। তার আর একটা সুবিধা ছিল এই যে, বাতাস বইছিল তার বিপরীত দিক থেকে। শূকরীও বাচ্চাগুলোর কাছ থেকে কিছুদূরে গিয়ে পড়েছে। বড় বাচ্চাটাও বাঘটার কাছে ঘুরতে-ঘুরতে সরে এল। মনে হতে লাগ্‌ল, এই বুঝি বাচ্চাটার ঘাড়ে বাঘটা লাফিয়ে পড়ে! মিনিট-খানেকের মধ্যে হয়ত সে পড়্‌তও, কিন্তু হঠাৎ দেখি, একটা গোখ্‌রো সাপ লম্বা ঘাসের মধ্য থেকে স্প্রিংয়ের মত ফণা তুলে বাঘটার ঘাড়ে ফোঁস করে একটি ছোবল দিলে।

নিমেষের ব্যাপার! বাঘটা হাঁক ছেড়ে লাফিয়ে উঠ্‌ল। তারপরই সাপটাকে আর দেখা গেল না। শূকরীও তার ছানাগুলোকে নিয়ে বনের মধ্যে গা ঢাকা দিলে। চিতা-বাঘটার শেষ অবস্থাটা আপনারা কল্পনা করতে পারছেন? জানোয়ারটা ক্রমে ঝিমিয়ে ঘুমিয়ে পড়্‌ল। তাড়াতাড়ি পাথরের ওপর থেকে নেমে গিয়ে দেখি, তার সারা দেহ পাথরের মত শক্ত হয়ে গেছে।

সেদিন সকাল থেকে এগোবো কি না, তখনও ঠিক করি নি। শক্তিধরের হাতের ক্ষত সাংঘাতিক না হলেও একটা দিন অন্ততঃ বিশ্রাম দরকার। তা ছাড়া, কাছেই জল; বিশ্রামের জন্য আশ্রয়টিও পাওয়া গেছে বেশ! একটু ঘুরলে বনের মধ্যে দু' চারটে হরিণই বা কোন্ না-মিল্‌বে? আর আমরা তো বিশেষ কোন কাজে বের হই নি যে, তাড়াতাড়ি এগিয়ে চলা দরকার। এই সব ভাব্‌তে-ভাব্‌তে নদীর তীর ধরে বরাবর পূবমুখে চল্‌তে লাগ্‌লুম। যাবার সময় শক্তিধরকে বলে গেলুম, সে যেন সতর্ক থাকে, তার নীচে নাম্‌বার

বিশেষ দরকারও নেই, আমি কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরব।” বলে মিঃ ফরেষ্টার বনের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবতে লাগ্‌লেন!

মিঃ ব্রেকার বলে উঠ্‌লেন, “ঐ শুন্‌তে পাচ্ছেন ?”

“কি ?”

তিনজনেই কান পেতে শুন্‌তে লাগ্‌লেন, খুব দূরে কোথায় বাঘ ডাক্‌ছে। ডাকটা যেন পাহাড়ের কোল থেকে ভেসে আসছে বলে মনে হতে লাগ্‌ল।

মিঃ ফরেষ্টার বল্লেন, “তারপর শুনুন। আমি ত এক্‌লা চলেছি। প্রায় ক্রোশ-খানেক দূরে গিয়ে একপাল শিঙ্‌ওয়ালা হরিণের দেখা পেলাম। কিন্তু হরিণগুলো আমার সন্ধান পেয়েই বনের মধ্যে লুকিয়ে পড়ল। তাদের পরই দেখা দিল, একজোড়া কৌতূহলী হায়েনা। তারা হয়ত মানুষ কখনও দেখে নি। একটা ঝোপের আড়াল থেকে দুটোতে কৌতূহলের সঙ্গে আমার দিকে তাকাতে লাগ্‌ল। আমি অবশ্য তাদের দিকে মনোযোগ না দিয়ে আরও ক্রোশখানেক এগিয়ে চলে গেলুম।

জায়গাটায় বেশ বড়-বড় ঘাস ছিল, নদীও একটু চওড়া। কিন্তু তার স্রোত এত প্রখর যে, একটা বড় পাথরকে স্বচ্ছন্দে টেনে নিতে পারে। নদীর পারে জঙ্গলও বেশ গভীর। তখন একটু অন্যমনস্ক হ'য়েই পড়েছিলুম। হঠাৎ সমুখে একটা হাঁক শুনে তাকিয়ে দেখি, এক জোড়া বুনো মহিষ! মহিষ দুটো আমার দিকে ক্রুদ্ধ চোখে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

হিংস্রতায় বুনো মহিষ সিংহকেও হার মানায়। মহিষ দুটো

রাইফেলের পাল্লার মধ্যেই ছিল। সেখান থেকেই একটাকে গুলি করলুম। গুলিটা তার গায়েও বিদ্ধ হ'ল; কিন্তু তাতে একটুও কাতর না-হয়ে সে ভয়ঙ্কর হাঁক ছেড়ে, শিঙ্ নীচু করে, লেজ তুলে আমার দিকে ছুটে আস্‌তে লাগল। তখন ছুটে পালানোও নিরাপদ নয়। আর, পালাবই বা কোথায়? রাইফেলটা বাগিয়ে ধরে স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলুম।

আহত মহিষটা ছুটে আসছে। দ্বিতীয় মহিষটা খুব চঞ্চল হয়ে পিছনের ঝোপের দিকে ফিরে দাঁড়াল। তারপরই—ও কি! একপাল বুনো মহিষ! নদীর ধারের গাছপালার মধ্যে থেকে বেরিয়ে তারা হাঁক ছাড়তে ছাড়তে আমার দিকে ছুটে আসছে! তাইত, মহিষটা আর বেশী দূরে নেই! আমার তখনকার অবস্থা সহজেই বুঝ্‌তে পারছেন। একবার মনে হ'ল, নদীতে লাফিয়ে পড়ি। কিন্তু তাহলেও মৃত্যু নিশ্চয়। পিছনে তাকিয়ে দেখি, কাছে-কিনারে কোন বড় গাছও নেই। মহিষের সঙ্গে ছুটে পারাও একরকম অসম্ভব। অথচ ছুটে পালানো ছাড়া আর উপায়ও নেই। দূরে একটা সুদীর্ঘ শাল গাছ দেখা যাচ্ছিল। আমি তার দিকেই ছুট্‌তে আরম্ভ করলুম।

কিন্তু বেশীদূর যেতে পারলুম না। আহত মহিষটা খুব কাছে এসে পড়ল। এত কাছে যে, তার ঘন-ঘন নিশ্বাসের শব্দ শুন্‌তে পার্‌চি। সে ছুট্‌তে-ছুট্‌তে থেকে-থেকে বিকট হাঁক ছাড়ে। তারও পিছন থেকে মহিষের পালের খুরের খটাখট্ শব্দ ও ঘন-ঘন ক্রুদ্ধ হাঁক শোনা যাচ্ছে। মনে হতে লাগ্‌ল, একদল অশ্বারোহী সৈন্য যেন আমাকে তাড়া করে ছুটে আসছে! এবার আর কোনমতেই রক্ষা

নেই। মহিষের শিঙে ও তীক্ষ্ণধার খুরে আমার দেহ ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যাবে। ঐ বুঝি তারা আমার ওপর লাফিয়ে পড়ে দেহটাকে বিদ্ধ করে ভেঙ্গে, পিষে ফেল্লে।

সেই গাছটা তখনও কিছুদূরে! আমি প্রাণপণ শক্তিতে তার দিকে ছুটছি। আহত মহিষটা আমার পিছনে হাত-আটেকের মধ্যে এসে পড়েছে। মৃত্যু নিশ্চিত! কিন্তু সাম্‌নেই একধারে খানকয়েক প্রকাণ্ড পাথর পড়ে ছিল। তার একখানা ছিল—হাত-কয়েক আগে। তার যে কোন একটার ওপর ওঠে দাঁড়ালে হয়ত রক্ষা পাওয়া যেতে পারে! কিন্তু ওঠ্‌বার সময়ও ছিল না। ভাব্‌লুম্, যতক্ষণ পারা যায়, তার আড়ালে গিয়েই আত্মরক্ষা করি। তারপর,—ভাগ্যে যা আছে তাই হোক্।

ছুটতে-ছুটতে একখানা পাথরের আড়ালে গিয়ে পড়বার সঙ্গে-সঙ্গেই আহত মহিষটা আমার পিছনে হাত-খানেকের মধ্যে এসে পড়্‌ল। শয়তানীতে সেও কম নয়। সেও নিমেষের মধ্যে ঘুরে সেদিকে এল। বিপদের সময় ধৈর্য্য হারালে বিপদ আরও বাড়ে। আমিও চট্ করে পাথরটার ওপাশে ঘুরে গেলুম।—সেও ঘুরল! এমনি ভাবে প্রায় মিনিট খানেক দু'জনে পাথরটাকে কেন্দ্র করে ঘুরপাক দিতে লাগ্‌লুম। এতে মহিষটার রাগ আরও বেড়ে গেল।

ওদিকে মহিষের পাল ততক্ষণে কাছে এসে পড়েছে। এমন ভাবে ফাঁকি দেওয়াও আর চল্‌বে না। তফাতে তিনখানা পাথরের মাঝে খানিকটা জায়গা ফাঁকা দেখা যাচ্ছিল। আমি ছুটে গিয়ে তার মধ্যেই ঢুকে পড়লুম। কিন্তু তাতেও রক্ষা ছিল না। সবগুলো মহিষের পক্ষে সেখানে সম্ভব না হলেও, একটা মহিষ তার মধ্যে

একটু চেষ্টা করলেই ঢুক্‌তে পারে। তবে তার প্রকাণ্ড শিঙ্‌-সুদ্ধ মাথাটা নিয়ে ঘুরে বার হবার মত জায়গা ছিল না। কিন্তু মহিষের বুদ্ধি! আমার ঢোক্‌বার সঙ্গে-সঙ্গেই মহিষটাও শিঙ্‌সুদ্ধ মাথাটা তার মধ্যে গলিয়ে দিলে।

সে এক পরম সুযোগ! আর তিলমাত্র সময় নষ্ট না করে তার মগজে গুলি চালালুম। আর দরকারও হ'ল না। ঐ একটি মাত্র গুলিতে সে পাথরের ফাঁকে মুখ থুবড়ে পড়ল। মহিষের পালও সেই মুহূর্তে এসে উপস্থিত হয়ে চারদিক থেকে পাথর তিনটের গায়ে খটাখট্‌ শব্দে শিঙের গুঁতো মারতে লাগ্‌ল। দুটো মহিষ আবার সেই ফাঁক দিয়ে ভিতরে আসবার নানারকম চেষ্টা সুরু করে দিলে; কিন্তু মরা মহিষটা পথ আগলে পড়ে থাকায় তা সম্ভব হ'ল না। তারা অগত্যা সেই তিনখানা পাথরের ওপরই রাগ মিটাতে লাগ্‌ল।

তাদের শিঙের ধাক্কায় অত বড়-বড় পাথর কেঁপে-কেঁপে ওঠে। চারধারে তাদের ক্রুদ্ধ হাঁক-ডাকের প্রতিধ্বনি শোনা যায়। এক-একবার মনে হয়, এই বুঝি পাথর তিনখানা আমার ঘাড়ের ওপর কাৎ হয়ে পড়ে! আর মিনিট-কয়েক এইভাবে চেষ্টা চল্‌লে হয়ত তাও হ'ত। কিন্তু হঠাৎ কি কারণে বুঝতে পারলুম না, মহিষগুলো নিঃশব্দ ও স্থির হয়ে দাঁড়ালো।

তাদের মাথায় আর কোন দুষ্টু ফন্দী গজিয়েছে কি? ছোট ফাঁকটার মাঝ দিয়ে তাকিয়ে দেখি, তারা নদীপারে জঙ্গলের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। জঙ্গলটাও একটু-একটু নড়ছে। একটা উৎকট গন্ধ আমারও নাকে লাগ্‌ল। তারপরই একটা মহিষ ছোট গোছের একটা হাঁক ছাড়্‌তেই তারা যেদিক থেকে আমাকে তাড়া

করে এসেছিল, সেদিকেই ছুটতে লাগল। সেই ফাঁকের মধ্য দিয়ে দেখলুম, বনটা যেখানে খুব গভীর হয়েছে, মহিষগুলো তার মধ্যে ঢুকে পড়ল। কিছুক্ষণ সেদিক পানে তাকিয়ে থেকে আমিও বেরিয়ে পড়লুম। বেলা তখন প্রায় তিনটে হবে। ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও পরিশ্রমে শরীর ও মন অবসন্ন—"

মিঃ ফরেষ্টারের এই কথাগুলোর সঙ্গে-সঙ্গেই বাবুর্চ্চিরা তাঁদের সামনে গরম-গরম খানা হাজির কর্‌লে। তৎক্ষণাৎ তিনজনে তাতে মনোনিবেশ কর্‌লেন। তারপর, খাওয়া-দাওয়া শেষ করে তিনজনে তিনটে চুরুট ধরিয়ে, মোটা কম্বলের মধ্যে আরাম করে বসতেই মিঃ ফরেষ্টার আস্তে-আস্তে বল্‌তে লাগ্‌লেন।

তাঁবুর এক কোণে একটি আলো মিট্‌-মিট্‌ করে জ্বলতে লাগল।

চার

"চল্‌তে-চল্‌তে এক-একবার পিছন ফিরে তাকাই, পিছনে শত্রুদল আবার ধাওয়া করেছে কি না! তার সম্ভাবনা অবশ্য খুব কমই ছিল। কেননা মহিষ মানুষ নয়। তা ছাড়া, তারা তখন আর এক শত্রুর কবল থেকে আত্মরক্ষায় গা-ঢাকা দিয়েছে। সে শত্রু যে কি, তা বোধ হয় আপনারা বুঝতে পেরেছেন?"

মিঃ ব্রেকার ও ধীরেন বাবু মাথা নেড়ে জানালেন—"হাঁ।"

মিঃ ফরেষ্টার তবুও বল্লেন, "সেটা নদী-পারের বাঘ। এবার আমিও দেখ্‌তে পেলুম, বাঘটা নদীর ধার দিয়ে চলে যাচ্ছে; আর, এক-একবার ঘাড় ফিরিয়ে এপার পানে তাকাচ্ছে। কিন্তু নদীটা পার হবার তার উপায় নেই। সেজন্য আমারও দুর্ভাবনার কোন কারণ ছিল না। কিন্তু ভাবনা হচ্ছিল, শক্তিধরের জন্য। বেচারা আহত; তার ওপর ঐ টাঙিখানা ছাড়া আর দ্বিতীয় অস্ত্র তার কাছে নেই। আমার দেরী দেখে যদি সেখানি সম্বল করে, আমায় এই গহন বনে খুঁজতে বেরিয়ে থাকে, তাহলে তাকে আর ফিরে পাব না।

কিন্তু তার বিপদের কথা ভাব্‌তে-ভাব্‌তে দেখি, ঝোপ থেকে আমার সমুখে মূর্ত্তিমান বিপদ বেরিয়ে এল, এক দাঁতালো শূকর! তার রাগের কারণ কিছু বুঝতে পারলুম না। সে ঘাড় নীচু করে ঘোঁৎ-ঘোঁৎ শব্দে আমার দিকে ছুটে আস্‌তে লাগ্‌ল। সেই মুহূর্ত্তেই সেটাকে শেষ করবার সুযোগ থাক্‌লেও শেষ অবধি কি করে দেখ্‌বার

জন্যে আমি প্রস্তুত হয়ে দাঁড়ালুম। শূকরটাও তেমনি ভাবে ছুটে আস্‌তে লাগল।

মাত্র হাত দশ-বারো দূরে এসে পড়তেই তার একটি দাঁত লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়লুম। দাঁতটি উড়ে গেল; শূকরটাও থম্‌কে দাঁড়াল। কিন্তু সে নিমেষের জন্য। তারপরই বিকট এক চীৎকার করে, সে দ্বিগুণ বেগে ছুটে আসতে লাগল। তার বাকী দাঁতটি লক্ষ্য করে আমিও গুলি ছাড়লুম; কিন্তু গুলিটা তার দাঁতে না লেগে সাম্‌নের একখানি পা ভেঙ্গে দিলে। শূকরটা তিন পায়ে ভর দিয়েই আমার দিকে ছুটে এল।

তখন আর নূতন গুলি পূরবার সময় নেই। আমি চট্‌ ক'রে একপাশে সরে গিয়ে রাইফেলটা উল্‌টিয়ে ধরে, তার মাথায় সজোরে আঘাত করলুম। শূকরটা মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। তৎক্ষণে আমি তার পিছনে। সেও উঠে দাঁড়াল। কিন্তু আর আক্রমণ না করে কাত্‌রাতে কাত্‌রাতে পাশের ঝোপটার মধ্যে সেঁধিয়ে পড়ল।

সেখান থেকে আস্তানাও আর বেশী দূর ছিল না। তাড়াতাড়ি চলে সন্ধ্যার মুখেই পাথরখানার কাছে পৌঁছলুম। শক্তিধর আমার অপেক্ষায় বসে ছিল। তার পাশে আরও একজন কে বসে।

বিশ্রাম ও আহারের শেষে পরিচয়ে জানলুম লোকটা নদীপারে পাহাড়ের তলায় ছোট গাঁ খানিতে বাস করে। কাল বেলা-শেষে তারা এই দিকে বনের মাথায় ধোঁয়া দেখতে পেয়েছিল। আজ তাই সন্ধান নিতে এসেছে, এ বনে কে এল! কখনও কখনও অনেক ডাকাত নাকি পুলিশের ভয়ে এই বনের মধ্যে গা ঢাকা দিয়ে বাস করে। ফলে বাঘের মুখে তাদের অনেকেই প্রাণ হারায়। প্রায়

এক বছর আগে আমরা যে পাথরটাতে আশ্রয় নিয়েছি, ওর নীচে এক ভয়ানক কাণ্ড হয়েছিল! লোকটা হয়ত ডাকাতই হবে; পালিয়ে এসেছিল। একদিন গাঁয়ের সকলে এদিকে শূকর শিকারে এসে পাথর-খানার নীচে প্রকাণ্ড এক অজগরকে দেখতে পায়। পেটটা তার ফুলে ঢোল; নড়্‌তে চড়্‌তে পারে না। মরার মত পড়ে আছে।

সাপটাকে সকলে তৎক্ষণাৎ মেরে পেট কেটে দেখে, লাল-ঝোল মাখানো, তাল-গোল পাকানো একটা মানুষ। লোকটার গায়ে একটা ফতুয়া, পরণে লুঙ্গী, হাতে সোণার আংটি। কিন্তু একটি আঙ্গুল কাটা। তখন আর কি হবে? লোকটাকে নদীর জলে ভাসিয়ে সাপটাকে গাঁয়ে নিয়ে গিয়ে সকলে খাওয়া-দাওয়া করলে। তার মাংস ছিল খুব মিষ্টি। সাপটাকে মারবার আগের দিনও তারা বনের মাথায় এমনি ধোঁয়া দেখেছিল। তাই আজ সন্ধানে এসেছে, সাপের ভোজ আবার হবে কি না! কিন্তু সাপের বদলে শক্তিধরকে দেখে, তার সঙ্গে বসে আলাপ জমাচ্ছে। তাদের গাঁয়ের আশে-পাশে বাঘ-ভালুকের আড্ডা। মাঝে-মাঝে হরিণের পালও দেখা যায়। ক্রোশ পাঁচ-ছয় দূরে গেলে হাতী ও গণ্ডার মিলবে। স্থির করলুম, ওদের গাঁয়েই যাব। তিন জনে রাতখানা ঐ পাথরের ওপর কাটিয়ে পরদিন গাঁয়ের দিকে রওনা হলুম।

নদীর ধারে-ধারে পথ, উঁচু-নীচু। মাটি কাল ও কাঁকরে ভরা। প্রায় ক্রোশ-খানেক চলে যাবার পর একটা ছোট পোলের কাছে এলুম। নদীর ওপর একটি মাত্র গাছের গুঁড়ি ফেলে পোলটা তৈরী। গুঁড়িটাও খুব বেশী মোটা নয়। তার অনেক নীচে, প্রায় দু'শো ফুট নীচ দিয়ে নদীটা ঘোর রবে গর্জ্জন করে ছুটে চলেছে, যেন চারখানা

মেল ট্রেণ এক সঙ্গে ছুটছে! জলের মূর্ত্তিও ভয়ঙ্কর! মাঝে-মাঝে দূর থেকে এক-একখানা পাথরকে মাথায় করে ঠেলে আন্‌ছে। পাথরে পাথরে ঠোকাঠুকি লেগে হুম্-দাম্ শব্দ উঠ্‌ছে, যেন কামান-গর্জ্জন!

পোলটা পার হবার সময় নীচের দিকে তাকিয়েই জঙ্গলীটা আনন্দে চীৎকার করে উঠ্‌ল! আমরাও দেখলুম, একটা প্রকাণ্ড শিং-ওয়ালা হরিণ স্রোতের টানে ভেসে আসছে। হরিণটা তখনও জীবন্ত ছিল। তীরে উঠ্‌বার জন্যে সে প্রাণপণ চেষ্টা করছে। কিন্তু স্রোতের ধাক্কায় এক-একবার উল্‌টিয়ে যাচ্ছে, আবার সোজা হচ্ছে। তারপর একটু যেতে না যেতে অর্দ্ধমগ্ন পাথরের গায়ে ধাক্কা লেগে নিস্তেজ হয়ে পড়্‌ছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই তার মৃত্যু নিশ্চিত। এক-একবার হরিণটার কাতর ডাকও যেন কানে আস্‌তে লাগ্‌ল। কিন্তু তাঁকে বাঁচাবার সাধ্য আমাদের ছিল না। দেখ্‌তে-দেখ্‌তে নদীর স্রোত হরিণটাকে বাঁকের আড়ালে টেনে নিয়ে যেন আমাদের চোখের সাম্‌নে থেকে লুকিয়ে মুখে পুরলে!

পোলটা পার হয়ে আমরা কিছু দূর চলে গেলুম। পাহাড়টা এবার বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠ্‌ল। জঙ্গলীটা ছিল আমাদের তু'জনের আগে। চল্‌তে-চল্‌তে সে চম্‌কে দাঁড়িয়ে কানখাড়া করে রইলো। তারপর আমাদের দিকে তাকিয়ে খুব চাপা গলায় বল্লে, "হরিণ"।

আমাদের সাম্‌নের বনটা একটু-একটু নড়ছিল। পাতা-ছেঁড়া ও ছোট-ছোট ডাল-ভাঙ্গার মুট-মুট শব্দ উঠ্‌ছে। তাদের তু'জনকে পিছনে রেখে আমি খুব সন্তর্পণে হাত-পনেরো এগিয়ে গিয়ে একটা সেগুন গাছের আড়াল থেকে দেখলুম, একজোড়া শিঙ-ওয়ালা হরিণ নিশ্চিন্ত মনে পাতা খাচ্ছে। বোধ করি, তারাও আমাদের গায়ের

গন্ধ পেয়ে থাকবে। দুটোতেই ঘাড় ফিরিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে কয়েক মুহূর্ত্ত দাঁড়িয়ে রইল। তারপর পালাবার জন্যে লাফ দিলে। আমিও চক্ষের পলকে একটাকে গুলি করলুম।

গুলির আঘাতে সেটা মাটিতে গড়িয়ে পড়্ল। তার ওপরই আবার আর একটা গুলি। তবুও হরিণটা উঠে দৌড় দিলে। আমিও তার পিছনে ছুট্লুম। তার একখানি পা ভেঙে গেছে, পেটের নাড়িভুঁড়ি খানিকটা বেরিয়ে ঝুলছে, কিন্তু তার তেজ কম্ল না। বন-বাদাড় ভেঙ্গে ছুট্তে লাগল।

হরিণের সঙ্গে বাঘ ছুটে পারে না, মানুষ ত' কোন্ ছার! নিমেষে হরিণটা বনের মধ্যে অদৃশ্য হ'ল। ইতিমধ্যে জঙ্গলীটা ও শক্তিধর এসে আমার সঙ্গে যোগ দিয়েছে। আমরা রক্তের দাগ ধরে তার পিছনে ধাওয়া করলুম। কিছুদূর গিয়ে একটা ঝোপের কাছে পৌঁছতেই সেটা নড়ে উঠ্ল। হরিণটা হঠাৎ তার মধ্য থেকে বেরিয়ে দৌড় দিলে। আমরাও তার পিছনে ছুট্লুম।

আবার কিছুদূর গিয়ে সে একখানা পাথরের আড়ালে সরে পড়ল। কিন্তু তার রকম দেখে বোঝা গেল, সে খুবই কাতর হয়ে পড়েছে। এদিকে আমাদেরও অবস্থা সঙ্গীন। শেষে এক জায়গায় এসে দেখি, হরিণটা আর উঠতে পারছে না। আমরা তিনজনে যখন তাকে ছুটে গিয়ে চেপে ধরলুম তখনও সে জীবিত। সে শুয়ে-শুয়েই জঙ্গলীটার গায়ে একটা শিঙের গুঁতো দিলে। বেচারার পায়ে ইঞ্চি তিনেক গর্ত্ত হয়ে তীর-বেগে রক্ত বার হ'তে লাগ্ল। তার ক্ষত তৎক্ষণাৎ বেঁধে দিলুম।

তারপর মরা হরিণটাকে ঘাড়ে করে তিনজনে যখন গাঁয়ে গিয়ে

পৌঁছলুম, তখন বেলা দশটা। সেদিন আর শিকারে বার হলুম না। কয়দিনকার পরিশ্রমে ও অনাহারে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলুম বলে বিশ্রাম নিতে লাগ্‌লুম। সারাদিন গল্প-গুজবে কেটে গেল। রাতে সকাল-সকাল খেয়ে নিয়ে গাঁয়ের মোড়লের বাড়ীর একখানা চালার নীচে শুয়ে পড়লুম। শক্তিধর কাছেই রইল।

একটা কথা আমি বল্‌তে ভুলে গেছি—সময়টা তখন বসন্তকাল। এক পাহাড়ে' জায়গা, তার ওপর জঙ্গল ; কাজেই রাতের বেলা একটু শীত ছিল। আমি ত কম্বল জড়িয়ে আরাম করে ঘুমুচ্ছি। রাত তখন কত হবে জানি না, বাইরে থেকে একটা অস্বাভাবিক শব্দে ঘুম ভেঙ্গে গেল। কিন্তু চোখ মেলে তাকাতে ইচ্ছে হ'ল না। মনে করলুম, গাঁয়েরই কোন কুকুর। শুয়ে-শুয়েই তাড়া দিলুম। তার কিছু পরেই মোড়লের গোয়াল থেকে গরু ও ছাগলগুলো আর্ত্তনাদ করে উঠ্‌ল। মনে হ'ল, তারা যেন গোয়ালের মধ্যে লাফালাফি ও হুড়োহুড়ি করছে!

সে শব্দে শক্তিধরেরও ঘুম ভেঙ্গে গেল ; মোড়লের বাড়ীর সকলেও জেগে উঠেছে। তারপরই কানাস্তারা পেটার আওয়াজ, লোক-জনের চীৎকার ও কুকুরের ডাকে সারা গাঁ গম্‌-গম্‌ করতে লাগল। মোড়লের সঙ্গে গোয়ালে ছুটে গিয়ে দেখি, গরু ও ছাগলগুলো ভয়ে থর্‌-থর্‌ করে কাঁপছে। কিন্তু দুধওয়ালা কালো গরুটা নেই, গোয়ালের মেঝেয় বড়-বড় থাবা ও রক্তের দাগ।

ভীষণ অন্ধকার রাত। গাঁয়ের চারিদিকে গভীর বন ; পূবে পাহাড়। তখন কোথায় গরুচোরের সন্ধানে যাব? স্থির করলুম, পরদিন ভোরে উঠে জানোয়ারটার খোঁজে বার হব। পরদিন সকাল

হ'তেই এক পেট খেয়ে বোতলে জল ও কিছু খাবার সঙ্গে নিয়ে মাঠের ওপরে ফোঁটা-ফোঁটা রক্ত দেখে একলাই বাঘের সন্ধানে বেরিয়ে পড়লুম।

ব্যাপারটা বড় অস্বাভাবিক বোধ হচ্ছে, নয়? কিন্তু মনে রাখবেন আগের রাতে যে গরুটাকে বাঘে নিয়ে গিয়েছিল, সেটাই এক শ' বন-ঠ্যাঙ্গাড়ের (Beaters) সমান কাজ করেছিল। কাজেই আমাকে বেশী পরিশ্রম কর্‌তে হ'ল না। গাঁ-ছেড়ে বনের মধ্যে ঢুকে পাহাড়ের দিকে প্রায় আধ মাইল চলে গিয়ে বাঘ ও গরুর সন্ধান পেলুম।

আমার সাড়া পেয়ে ঝোপের মধ্য থেকে বাঘ সরে গেল। ঝোপের কাছেই প্রকাণ্ড এক মহুয়া গাছ ছিল, আমি ঝোপের ভিতর তাকিয়ে দেখলুম, গরুটা তার মধ্যে পড়ে আছে। তার পিছনের দিকে খানিকটা জায়গায় মাংস নেই, গলার নলীতে দাঁতের দাগ। জিভ্‌টা বেরিয়ে পড়েছে ; চোখ দুটো স্থির হয়ে আছে।

আমি তখন থেকে বাঘের প্রতীক্ষায় সেই গাছে উঠে বসে রইলুম। কিন্তু সারা দিনের মধ্যে বাঘের দেখা পেলুম না। এমন কি, একটা শিয়ালও জায়গাটার কাছে ঘেঁষ্‌ল না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যেতে লাগ্‌ল।

সন্ধ্যার কিছু আগে থেকে আবার নূতন বিপদ জুটল—মেঘ। সন্ধ্যার পরই আকাশ অন্ধকার করে বৃষ্টি নামল, ঝড় উঠ্‌ল। ঝড়ের দোলায় গাছপালা তাণ্ডব নৃত্য সুরু করে দিলে। ঘন-ঘন বিদ্যুতের ঝলকে চোখ ধেঁধে যায়। কিছু দূরে একটা শালগাছের মাথায় বাজ পড়ে গাছটা দাউ-দাউ করে জ্বলে উঠ্‌ল।

সেই সময় কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য আমার জ্ঞান ছিল না। কিন্তু কি করে যে তখন আমি গাছের ওপর বসেছিলুম, এখনও ভাবি। জলে সর্ব্বাঙ্গ ভিজে উঠেছে। চুরুট ধরিয়ে শরীরটাকে একটু তাতিয়ে নেব তারও উপায় নেই। ভয় হ'তে লাগ্‌ল বারুদ ও গুলি জলে ভিজে নষ্ট হয়ে যাবে। কৃষ্ণপক্ষের রাত। জমাট অন্ধকারে গাছগুলোকে এক-একটা দৈত্যের মত বোধ হচ্ছে। এক-একবার বিদ্যুতের ঝলকে মাঝে-মাঝে ভিজে বনটা চোখে পড়ে! তখন তার চেহারা বড় অদ্ভুত।

অনেক রাতে বৃষ্টি ধরলেও ঝড় থাম্‌ল না। তবুও বাঘের দেখা নেই। মনে করলুম, বাঘটা আর আসবে না। চেষ্টা করে দেখা যাক্, যদি দেশলাইটা জ্বালিয়ে একটা চুরুট ধরাতে পারি!

পকেটে হাত দিতেই নীচে ঝোপ থেকে খস্-খস্ শব্দ উঠল। চোখ দুটো যথাসম্ভব সঙ্কুচিত করে নীচের দিকে তাকিয়ে দেখি, কুকুরের মত ছোটখাট একটা প্রাণী ঝোপের মধ্য থেকে খুব সাবধানে বেরিয়ে গরুটার কাছে এসে দাঁড়াল; তার পরেই আর একটা। কিন্তু তারা গরুটার খুব কাছে গেল না; একটু দূরে দাঁড়িয়ে রইল। ওপর থেকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে তাদের চোখ জ্বলছে। দুটোতে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। তারপর গরুটার দু'পাশে ঘুরে গিয়ে দাঁড়াল। একটা গরুটাকে খেতে আরম্ভ করলে; কিন্তু একটা কামড় দিয়েই দুটোতে হঠাৎ পালিয়ে গেল।

পরক্ষণেই দেখি, রাগে গর্-গর্ করতে-করতে ঝোপের মধ্য থেকে একটা বাঘ বেরিয়ে এল। তার দু'চোখ দিয়ে যেন আগুন বার হচ্ছে। বাঘটা গর্-গর্ করতে-করতে চারদিকে তাকতে লাগ্‌ল।
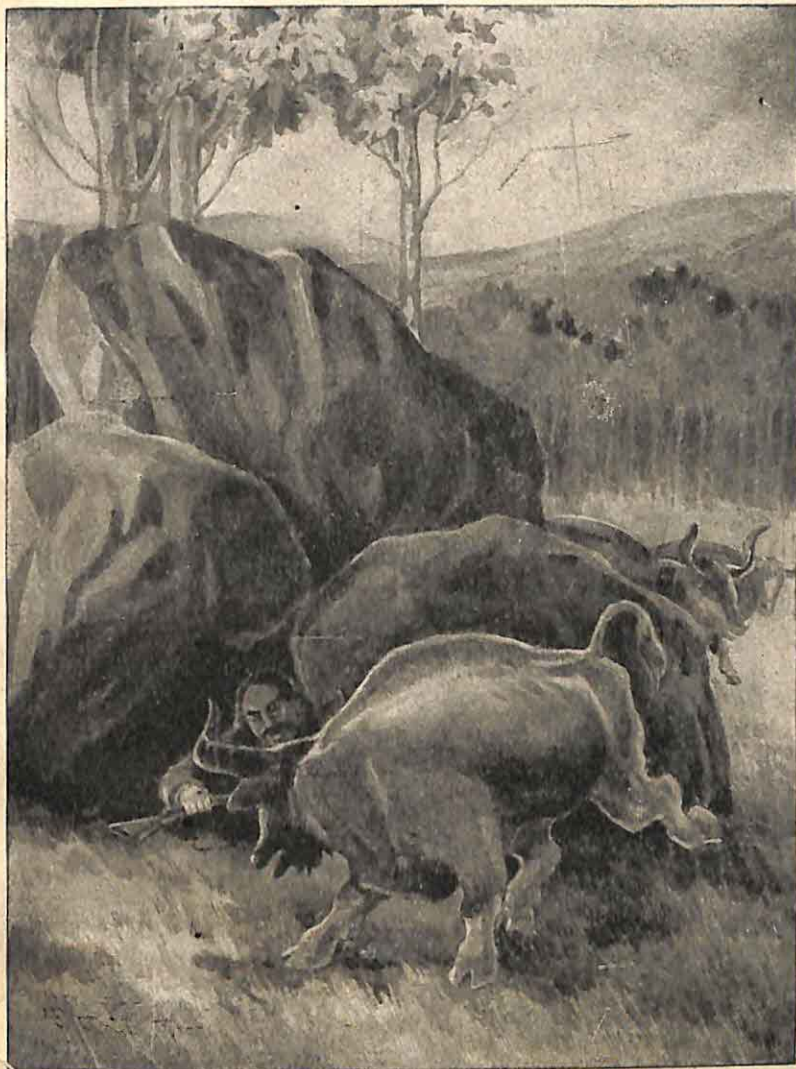
মহিষের পাল চারিদিক থেকে খটা-খট্ শব্দে পাথরে শিঙের গুঁতো মারতে লাগ্ল !

একবার ঝোপের মধ্যে ঢুকে গেল, তৎক্ষণাৎ আবার বেরিয়ে এল। গরুটার চারিদিকে সে একবার ঘুরপাক দিলে, যেন কিসের সন্দেহ হয়েছে! কিন্তু এ ভাব নিমেষে কেটে গেল। তারপর ছুটে গিয়ে কড়্-কড়্ শব্দে গরুটাকে খেতে লাগ্‌ল। সেই সুযোগে আমি রাইফেল তুলে টিপ করতেই বোধ হ'ল, আমার সারা গায়ে কি সব সুড়্-সুড়্ করে চলে বেড়াচ্ছে। হঠাৎ গোটাকয়েক আমার হাতে ও গলায় কামড়ে দিলে; তাদের বিষে শরীর ঝন্-ঝন্ করে উঠ্‌ল। সর্ব্বনাশ! এ যে কাঠ্‌পিঁপড়ে! নীচে বাঘ, ওপরে কাঠ্‌পিঁপড়ে!

পিঁপড়েগুলো আমার জামার হাতার ভিতর ঢুকে গেল—মুখ, কান ও কপালের ওপর দিয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগল। রাত পোহাতে তখনও ঘণ্টা ত্নই বাকি। গাছের ওপর থাকলে কাঠ্‌পিঁপড়ের বিষে প্রাণ যাবে। নীচে নামলে বাঘের মুখে প্রাণ যাওয়া অসম্ভব নয়। যদি বাঘটাকে মারতে পারি তাহ'লে রক্ষা। বিষের জ্বালায় যথাসম্ভব স্থির থেকে গুলি ছুঁড়লুম! বাঘটা হাঁক ছেড়ে লাফিয়ে উঠল। তারপরেই গরুটার একধারে পড়ে কাত্‌রাতে লাগ্‌ল।

একবার তার নজর পড়ল গাছের ওপর। আমাকে দেখে এক প্রকাণ্ড হাঁক ছাড়লে। মনে হ'ল একবার যেন ওঠবার চেষ্টা করলে, কিন্তু পারলে না। আমি আন্দাজে তার শরীর লক্ষ্য করে আবার একটা গুলি ছেড়ে তাড়াতাড়ি নূতন গুলি পূরে নিলুম। কিন্তু দ্বিতীয় গুলিটা তার গায়ে লাগ্‌ল না। একটা পাথরে লেগে ঠিক্‌রে গেল বলে মনে হ'ল।

এদিকে গাছের ওপর থাকাও অসম্ভব হ'য়ে উঠেছে। পিঁপড়ের কামড়ে আমার গলা, হাত, ঠোঁট ফুলে উঠ্‌ল। যন্ত্রণায় হাত দুটো অবশ হয়ে এসেছে। যে-কোন মুহূর্ত্তেই হাত ফস্কে গাছের নীচে পড়তে পারি। তাহ'লে আহত বাঘের সম্মুখেই হয়ত পড়ব। ফলে যে কি হবে, তাও জানি। এখন দৈব ছাড়া আর রক্ষা নাই। পিঁপড়ের কামড়ে মরার চেয়ে বাঘের সঙ্গে লড়াই করে মরা ভাল।

কোমরে হাত দিয়ে দেখলুম, ছোরাখানা ঠিক আছে। সেখান থেকে তাড়াতাড়ি হাত-কয়েক নীচে একটা ডালে নেমে এলুম। বাঘটা ছিল সেখান থেকে মাত্র হাত-আষ্টেক নীচে আধ-শোয়া অবস্থায়। কাছেই আমাকে দেখে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করতে লাগ্‌ল। একটা লাফও দিলে; কিন্তু শরীরের খানিকটা উঠ্‌ল মাত্র। এবার বুঝলুম, তার মেরুদণ্ড ভেঙ্গে গেছে। শত্রুর দুর্ব্বলতা জানতে পারলে শক্তিহীনের সাহস ও শক্তি বেড়ে যায়। আমি তৎক্ষণাৎ গাছ থেকে আর এক পাশে নেমে, তাকে আর একটি গুলিতে শেষ করলুম।

ঠিক তখনই কানে এল, বনের বাইরে থেকে কারা যেন চীৎকার করছে ও কানাস্তারা বাজাচ্ছে! সেদিককার বনের মাথা লাল হ'য়ে উঠেছে। শব্দটা ক্রমেই কাছে আস্‌তে লাগ্‌ল। মশালের আলো ও ধোঁয়া বেশ স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা হৈ-হৈ শব্দে সেখানে এসে হাজির হ'ল। সকলের আগে গাঁয়ের মোড়ল। তারা আমার বন্দুকের আওয়াজ শুনেই গাঁ থেকে রওনা হয়েছিল। মোড়ল এসেই মরা বাঘটার পিঠে চড়ে আনন্দে

নাচ্‌তে সুরু করে দিলে। শক্তিধরের মুখে গর্ব্বের হাসি! আমারও যে আনন্দ না হয়েছিল, তা নয়। তারপর মরা বাঘটাকে নিয়ে সকলে যখন গাঁয়ে ফিরলুম, তখন পূর্ব্বদিক ফর্সা হ'য়ে এসেছে।

সেদিনকার এই বিপদ এমনি কাট্‌ল বটে কিন্তু তার পরের দিন যা ঘট্‌ল, তা বড় ভয়ঙ্কর।

পাঁচ

সেদিনও সেই গাঁয়ে কাটিয়ে পরদিন সকালে আমরা দু'জনে রওনা হলুম আরও উত্তরে। যাত্রাকালে গাঁয়ের সব লোক, বিশেষ করে মোড়ল আমাদের সেদিক পানে যেতে নিষেধ করলে। বল্লে,—"ওদিকে আপনাদের মত যারা যায়, তারা কেউ ফিরে আসে না। আপনারা এই গাঁয়ে আরও কিছুকাল কাটিয়ে দেশে ফিরে যান! এর আশপাশে অনেক শিকার মিলবে।"

কিন্তু বিপদের কথা শুনে, সেটা সত্যকারের বিপদ কি কেবলমাত্র গল্প, তা জানবার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠলুম। বল্লুম,—"ফিরে এসে বল্‌ব কেমন বিপদ্!"

মোড়ল কপালে করাঘাত করে বল্লে,—"হায় কর্ত্তা!"

সেখান থেকে বেরিয়ে আমরা বরাবর উত্তর দিকে চল্‌তে লাগ্‌লুম। গাঁয়ের সকলে আমাদের সঙ্গে কিছুদূর এসে বিদায় নিয়ে ফিরে গেল। তখন আমরা দুটিতে একলা চলছি। চারিদিকে গভীর বন। লতায়-লতায়, ডালে-ডালে জোট পাকিয়ে অগম্য হয়ে আছে। মাঝে-মাঝে কাঠুরিয়াদের পায়ে-পায়ে তৈরী দু-একটা সরু পথ চোখে পড়ে। কিন্তু কিছুদূর গিয়েই তাও হারিয়ে গেল।

পাহাড়টা ক্রমে কাছে এগিয়ে আস্‌ছে। তার সবটা বেশ স্পষ্ট দেখা যেতে লাগ্‌ল। পাহাড়টার নীচে থেকে ওপরে মাঝ-বরাবর ঘন বাঁশবন। হাওয়ায় দুল্‌ছে। এ অঞ্চলটায় খানা-ডোবাও অনেক। সেগুলির তীরে-তীরে চলে দুপুরের দিকে পাহাড়ের নীচে বাঁশতলায়

পৌঁছলুম। ইচ্ছা ছিল, সেখানে একটু বিশ্রাম করে, খাওয়া-দাওয়া সেরে আবার চল্‌ব। তাই বেশ ঘন ছায়া-ঢাকা একটা জায়গা বেছে নিয়ে তার তলায় বসা গেল।

বেশ ঝির্ ঝির্ করে বাতাস বইছে। বসে থাক্‌তে-থাক্‌তে শক্তিধর বল্লে,—"ও কিসের শব্দ ?"

নিস্তব্ধ বন। প্রথমটা পাতায়-পাতায় বাতাসের সর্-সর্ শব্দ ছাড়া আর কিছু কানে এল না। বল্লুম,—"কৈ ?"

"ওই যে পিট্ পিট্ করছে!" বলেই সে চীৎকার করে লাফিয়ে উঠ্‌ল—"সরে আসুন, সরে আসুন—"

তার কথা শুনে চট্ করে উঠে দাঁড়াতেই চোখে পড়্‌ল বড়-বড় জোঁক—শুক্‌নো পাতার ওপর দিয়ে আমাদের দিকে ছুটে আসছে। সামনে, পেছনে আশেপাশে, যেদিকে তাকাই—জোঁক! বাঁশগাছের ওপর থেকেও টুপ-টুপ্ করে চারিদিকে ঝরতে লাগ্‌ল যেন পাকা জাম! ওপর পানে তাকিয়ে দেখি, ডালে-ডালে, পাতায়-পাতায় জোঁক!

"পালাও—পালাও!" আমরা দুজনে উর্দ্ধশ্বাসে বাঁশতলা থেকে ছুটে পালাতে লাগলুম। কিন্তু পালাব কোথায়? ঐ অঞ্চলটার সব জায়গায় জোঁক! ছুট্‌তে-ছুট্‌তে শুনলুম পিছনে খুরের খটাখট্ শব্দ! কিন্তু তখন পিছন ফিরে তাকিয়ে এক মুহূর্ত্ত সময় নষ্ট করতে ইচ্ছা হ'ল না। সমানে ছুটতে লাগলুম। কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যে শব্দটাও কাছে আস্‌তে-আস্‌তে আমাদের একেবারে পিছনে হাত-কয়েকের মধ্যে এসে পড়্‌ল।

শক্তিধর ছিল আমার পিছনে। সে চীৎকার করে উঠ্‌ল—"হরিণ—হরিণ!" বল্‌তে-বল্‌তেই গোটা-পাঁচেক হরিণ আমার সাম্‌নে

দিয়ে ছুটে যেতে লাগ্‌ল। তাদের পিঠে, পেটে, শিঙ্গের গোড়ায়, চোখের কোণে অনেকগুলো জোঁক লেগে আছে! তারা আমাদের চেয়েও বিপন্ন। ইচ্ছা হ'লেও গুলি করবার অবসর হ'ল না। এক মুহূর্ত্ত যদি স্থির হয়ে দাঁড়াই, তাহ'লে আর নিস্তার নেই। কেবলই ছুট্‌তে লাগলুম।

কিন্তু পরিশ্রমেরও একটা সীমা আছে। এ উৎপাত কোথায় শেষ হবে? হরিণগুলো ছুট্‌তে-ছুট্‌তে বামদিকে ঘুরে অদৃশ্য হয়ে গেল। সেই দিকটাই বোধহয় নিরাপদ হবে। আমরাও তাদের অনুসরণ করলুম। তারপর আর বেশী দূরও যেতে হ'ল না—একরকম গাছপালাশূন্য বিস্তৃত একটা মাঠের ধারে এসে পৌঁছলুম। কিন্তু হরিণগুলোকে সেখানে দেখতে পেলুম না। তারা বোধহয় মাঠের শেষে জঙ্গলে ঢুকেছে। আমাদের ছুজনেরই শরীর অবসন্ন, তৃষ্ণায় গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। চোখ ছুটো কোটর থেকে বেরিয়ে আস্‌ছে।

কম ত নয়! প্রায় দেড় মাইল ক্রমাগত উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে পেরিয়ে এসেছি। মাঠখানার বেশীর ভাগ অংশ পাথর। রৌদ্রে পাথর তেতে চাটুর মত হয়ে আছে। কিন্তু মাঝে-মাঝে তফাতে-তফাতে ছোট-ছোট ঝোপ; পাথরের ওপর তারা একটু-একটু ছায়া ছড়িয়ে দাঁড়িয়েছিল। তখন সেই ছায়াটুকুতেই মনে হ'তে লাগল যেন মরুভূমির মরূদ্যান! ছু'জনে একটা ঝোপের ধারে গিয়ে সটান শুয়ে পড়লুম।

প্রায় আধ ঘণ্টা সেই ভাবেই কাটিয়ে আমরা সেখান থেকে উঠে মাঠের শেষে বনের মধ্যে ঢুকলুম। এ বনটায় নানা রকমের বড়-বড়

গাছ ছিল। তলাটাও বেশ অন্ধকার। চল্‌তে-চল্‌তে একটা জায়গায় আস্‌তেই আমার মাথায় চারিদিক থেকে যেন শক্ত সূক্ষ্ম সুতো জড়িয়ে গেল! তাড়াতাড়ি হাত দিয়ে সেগুলো ছাড়াতে গিয়ে দেখি, মাকড়সার জাল। তার এক-একটা তন্তু, সাধারণতঃ যে সব মাকড়সার জাল চোখে পড়ে, তার তন্তুর চেয়ে চারগুণ বড় হবে।

জালটাকে ছিঁড়ে দেখলুম, দুপাশে দুটি গাছের গুঁড়ি একেবারে সাদা, যেন পাতলা তুলোর আস্তরণ দিয়ে মোড়া। তার একধারে একটা প্রকাণ্ড মাকড়সা বসে। শরীরটা তার আকারে একটা টাকার চেয়েও বড়—ঠ্যাঙ্‌গুলো কাঁকড়ার ঠ্যাঙের মত। পায়ে ও গায়ে বড়-বড় লোম —দেখলে ঘৃণা হয়। এই বনে এমনি ধরণের মাকড়সা ছিল আরও অনেক। যাই হোক, সেদিন আর বেশী দূর না চলে রাতখানা সেখানে কাটিয়ে পরদিন ভোরেই আমরা যাত্রা করলুম।

সঙ্গে কিছু হরিণের মাংস ছিল। পথে গোটা কয়েক হরিয়াল, ঘুঘু, ও একটা তিতির শিকার করে দুপুরের আহার শেষ করা গেল। তারপর আবার চলা। বনেরও শেষ নেই, আমাদেরও চলার বিরাম নেই। মাঝে-মাঝে শিস্ দিয়ে তরঙ্গ তুলে টিয়া পাখীর ঝাঁক ও হাঁসের সারি শন্‌শনিয়ে বনের ওপর দিয়ে উড়ে চলে। পাতার ফাঁকে দু'-একটা ময়ূর চোখে পড়ে। এ ছাড়া, আরও অনেক রকম পাখীর দেখা পাওয়া যেতে লাগ্‌ল। কিন্তু হিংস্র বা নিরীহ কোন চতুষ্পদের সন্ধান পাওয়া গেল না। এমনি ভাবে প্রায় ক্রোশ দুই আমরা পার হয়ে গেলুম। সমুখে দূরে—পাহাড়ের সারি বেশ স্পষ্ট ও বিরাট হয়ে উঠেছে! সেটা হিমালয়েরই একটা শাখা! ঐ সঙ্গে বনের গাম্ভীর্য্যও

নিবিড় বোধ হচ্ছে। তবু মোড়লের কথিত বিপদের তখনও দেখা নাই। হয়ত, কোনদিনই তার দেখা পাওয়া যাবে না!

কিন্তু শেষের কথাগুলো মনে-মনে উচ্চারণ কর্‌তে না কর্‌তেই আমাদের সমুখের বন থেকে একটা সুতীক্ষ্ণ শব্দ উঠে চারধার ছড়িয়ে গেল। ঐ সঙ্গে সেখানকার গাছ-পালাও একটু নড়্‌ল। তারপর সব চুপ্‌চাপ্‌!

আমরা দুজনে থম্‌কে দাঁড়িয়ে সেই দিকে তাকিয়ে রইলুম। কিন্তু চোখে কিছু পড়্‌ল না। শক্তিধর আমার কাণে-কাণে বল্লে—"বুনো হাতী।"

হাতী অত বড় জানোয়ার হ'লেও বনের মধ্যে দিয়ে তারা কেমন নিঃশব্দে যাওয়া-আসা করে, আপনারা জানেন। তারপর প্রায় মিনিট দুই কেটে গেল, তবুও কোন সাড়া-শব্দ নেই। হাতীটা যে সেখান থেকে ফিরে গেছে তা নিশ্চয়! তবুও বন্দুকটা বাগিয়ে ধরে খুব সন্তর্পণে সমুখে কয়েক পা অগ্রসর হ'তে গিয়ে আমার ডান দিকে তাকিয়ে দেখি, চাব্‌ড়া-বাঁধা বন্‌কলমী লতার আড়ালে প্রকাণ্ড দুটো দাঁত ও দুষ্টুমী ভরা এক জোড়া চোখ! হাতীটা কখন নিঃশব্দে সেখানে এসে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে আমাদের লক্ষ্য করছে। আমাদের ব্যবধান হাত ছয়-সাত! আমি তৎক্ষণাৎ তাকে গুলি করার জন্য বন্দুক তুল্‌তেই সে বিপুল বেগে ডালপালা ভেঙ্গে বেরিয়ে এসে আমাদের তাড়া কর্‌লে। বন্দুকের গুলি বন্দুকেই রয়ে গেল—আমরা দুজনে পিছন ফিরে উর্দ্ধশ্বাসে ছুট্‌লুম।

কিন্তু হাত-কয়েক গিয়েই দেখি, সমুখে আর একটা দাঁতালো হাতী গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে শুঁড় উঁচিয়ে তাড়া করে আস্‌ছে।

তাকেও গুলি করবার অবসর হ'ল না। তখনকার অবস্থা সহজে বুঝতে পারছেন—আমাদের সমুখে ও পিছনে দুটো প্রকাণ্ড বুনো হাতী। গাছে চড়ে যে আত্মরক্ষা করব, সে অবসর বা সুযোগও নেই। এমন একটা দিক্ ছিল না, যেটা নিরাপদ হ'তে পারে। অন্ততঃ আধ মিনিট সময়ও যদি পেতাম, তাহ'লে একটা হাতীকে মেরে ফেলা সম্ভব ছিল। সে সময়ই বা তখন পাই কি করে? আমরা দুজনে ডানদিকে ঘুরে ছুটতে লাগ্‌লুম।

কাঁটা গাছে হাত-পা ছড়ে রক্তাক্ত! লতায় পা আট্‌কে বার-দুই পড়ে গেলুম। ছুট্‌তে-ছুট্‌তে মুখে-চোখে চাবুকের মত ডাল-পালার আঘাত লাগে। শরীরও ক্রমে অবসন্ন হয়ে এল। একবার পিছন ফিরে দেখলুম—শক্তিধর নেই! কিন্তু হাতী দুটো হেলে-দুলে আমার দিকে ছুটে আস্‌ছে।

ছুট্‌তে-ছুট্‌তে শক্তিধরকে চীৎকার করে ডাক্‌লুম। উত্তরে হাতী দুটো গর্জ্জন করে উঠ্‌ল; শক্তিধরের সাড়া পেলুম না। হয়ত সে হাতীর পায়ের তলায় বা শুঁড়ের আঘাতে মারা গেছে। তখন নিজেকে বড় নিঃসঙ্গ বোধ হতে লাগল। মনে হ'ল, আমারও জীবনের শেষ হয়ে এসেছে। এই গহন বনে কেবল নিজেরই দোষে প্রাণ হারাতে হ'ল!

আবার ফিরে তাকিয়ে দেখি, হাতী দুটো আরও হাত দুই কাছে এসে পড়েছে। তাদের ঘন-ঘন নিঃশ্বাসের শব্দ শোনা যাচ্ছে। ঐ এল;—ঐ বুঝি তারা আমাকে শুঁড়ে করে শূন্যে তুলে ফেললে। কিন্তু তার আগে আমিও একটাকে অন্ততঃ সাংঘাতিক ভাবে জখম করবই।

এই ভেবে ফিরে দাঁড়াবার উদ্যোগ করতে পাথরের ধাক্কা লেগে পড়ে গেলুম। সেই সুযোগে হাতী দু'টো শুঁড় বাড়িয়ে হাত চার-পাঁচের মধ্যে এসে পড়ল—আর রক্ষা নেই! শরীর ও মনের সমস্ত শক্তি এক করে নিমেষে উঠে সামনের দিকে ছুটতেই হঠাৎ এক ভয়ঙ্কর শব্দ আমার কানে এল। তারপরই চোখে পড়্‌ল কুয়াসা ঢাকা এক বিস্তৃত উপত্যকা এবং পর-মুহূর্ত্তেই শত-শত ফিট্ গভীর এক খাদের ধারে এসে পড়লুম। তার বাঁ-দিক থেকে একটা নদী এসে ঘোর রবে তার মধ্যে ঝরে পড়্‌ছে। কুয়াসাটা এই নদীরই জলকণা।

ধারে পোঁছে প্রাণপণ শক্তিতে দৌড়ের ঝোঁক সাম্‌লাতে গিয়ে, পা ফস্‌কে সেই শত-শত ফিট গভীর খাদের মধ্যে পড়ে গেলুম। কিন্তু রাইফেলটা তখনও তেমনি হাতে আছে। পড়্‌তে-পড়্‌তে নীচের দিকে তাকিয়ে দেখি, গভীর অন্ধকার। সারা শরীর ঝিম্-ঝিম্ করতে লাগ্‌ল—প্রাণভয়ে একবার চীৎকার করে উঠ্‌লুম। তারপরই একটা গাছের প্রচুর ডালপালার মধ্যে আমি যেন আটকে গেলুম। তখন স্পষ্ট মনে হ'ল, দু'খানি অদৃশ্য হাত আমাকে সদ্য মৃত্যুর মুখ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে ঐ গাছের ওপর ফেলে দিলে।"…বলেই মিঃ ফরেষ্টার চুপ করলেন। ক্ষণিক চুপ করে থেকে আবার বল্‌তে লাগলেন—

"গাছের গোটাকয়েক ডাল অবশ্য আমার ভারে ভেঙে গেল! তার ফলে আমি গাছটার ঠিক মাঝখানে গিয়ে পড়লুম! আমার সারা শরীরের ভার রইল মোটা গাছের একটা ডালের ওপর। আমিও দু'হাত দিয়ে এই ডালটা জড়িয়ে ধরলুম। পড়বার সময়

বেগে গাছের ডালের ঘর্ষণে আমার হাত, পা, বুক জায়গায়-জায়গায় ছিঁড়ে গিয়ে রক্ত বার হ'তে লাগ্‌ল।

আমার তখনকার অবস্থাটা বোধহয় আপনারা ঠিক বুঝতে পারছেন না। নীচে শত-শত ফিট গভীর খাদ; শিলায়-শিলায় আছড়ে পড়ে তার মধ্য দিয়ে নদী গর্জ্জন করতে-করতে ছুটে চলেছে। প্রায় পঞ্চাশ ফিট ওপরে তীর;—আর আমি যে-গাছটার ডালে আটকে আছি, সেটা দেয়ালের গায়ে পেরেকের মত খাদের গা থেকে বেরিয়ে আছে। গাছটা খুব বড় ও মোটা না হ'লেও তার ডালপালা ও খাদের গায়ে শিকড় ছিল অনেক। তবুও আমার ভারে দুল্‌তে লাগ্‌ল! মনে হতে লাগ্‌ল, কখন বুঝি খাদের গা থেকে নীচে খসে পড়ে! একবার ওপর-পানে তাকালুম, যদি হাতী দুটোকে দেখতে পাই! কিন্তু ডাল-পালায় কিছু দেখা গেল না।

হাতীর কবল থেকে এভাবে রক্ষা পেলেও এই সঙ্গীন অবস্থা থেকে কি উপায়ে যে প্রাণ বাঁচাই, ভেবে পেলুম না। হয়ত এই গাছের ওপর অনাহারে, অনিদ্রায় তিল-তিল করে শুকিয়ে মরে একদিন খাদের মধ্যে লুটিয়ে পড়ব;—কেউ দেখবে না, জানতেও পারবে না। এক সঙ্গী ছিল শক্তিধর, সেও হয়ত মারা গেছে! তবুও বাঁচবার একবার শেষ চেষ্টা করে দেখি। এই ইচ্ছার সঙ্গে-সঙ্গেই আমার শরীর ও মনে শক্তি ফিরে এল।

বেশ ভাল করে তাকিয়ে দেখলুম, গাছটার গোড়ায় খাদের গায়ে হাত-খানেক চওড়া পাথর বেরিয়ে আছে, যেন একটা আল্‌সে! আল্‌সেটা খানিকটা আগে বাঁ-দিক থেকে বেরিয়ে বরাবর ডান-দিকে গিয়ে একটা চওড়া ফাটলের মধ্যে সেঁধিয়েছে। কোনরকমে যদি

ওখানে উঠে দাঁড়ানো যায়, তাহলে ওর ওপর দিয়ে সাবধানে চলে ঐ ফাটলের মধ্যে পৌঁছানো যাবে। তারপর? তারপর ভাগ্য।

কিন্তু কি করে যে ওখানে পৌঁছই, সে এক বিষম সমস্যা। পৌঁছলেও সোজা হয়ে চলতে পারব, তারও ঠিক নেই। একবার পা ফসকালেই মৃত্যু নিশ্চিত। তবুও রাইফেলটা পিঠে বেঁধে গাছটা বেশ শক্ত করে ধরে, বুকে ভর দিয়ে গোড়ার দিকে একটু-একটু করে সরে যেতে লাগ্‌লুম। আমরা নড়া-চড়ায় গাছটাও খুব দুল্‌তে লাগ্‌ল। প্রায় দশ মিনিট এইভাবে চলে গাছটার গোড়ায় পৌঁছে সেই আল্‌সেটার ওপর লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লুম। তারপর খুব সাবধানে আল্‌সেটার ওপর দাঁড়ালুম। আমার মুখটা রইল খাদের দিকে। সেখানে প্রায় পাঁচ মিনিট এইভাবে দাঁড়িয়ে, রাইফেলটা ঘুরিয়ে সামনে এনে, হাত দুটো দেওয়ালের গায়ে পাখীর পাখার মত ছড়িয়ে আস্তে-আস্তে পাশে হেঁটে সেই ফাটলের দিকে এগিয়ে যেতে লাগলুম।

এত আস্তে-আস্তে চলছিলুম যে, সেই ফাটলটার কাছে পৌঁছতে আমার প্রায় আধঘণ্টা সময় লাগ্‌ল। সেইসময়কার মনের অবস্থা আমি আজও ভুলিনি! সৌভাগ্যবশতঃ আল্‌সেটা ফাটলের মধ্য দিয়ে হাত-দুই ওপরে একখানা বড় পাথরের গায়ে গিয়ে মিশেছিল। সেই পাথরখানা আবার পৈঠার মত আর-একখানা হাত দুই উঁচু পাথরের কোলে বসানো। কিন্তু জলে ও শেওলায় ভয়ানক পিছল। ওপর থেকে সেই পাথরগুলোর গায়ে মোটা-মোটা লতা ও গাছের কতকগুলো শিকড় নেমে এসেছে। আমি আল্‌সে দিয়ে সেই

পাথরে উঠে,—দ্বিতীয় পাথর থেকে বহু কষ্টে লতা ও শিকড়গুলো ধরে, হাতকয়েক ওপরে একটা ছোট গুহার দ্বারে পৌঁছলুম।

গুহার ভিতরটা অন্ধকার! তার মধ্য থেকে কেমন একটা বিশ্রী পচা গন্ধ বেরিয়ে আসছে! বাইরে দু-একটা হাড়-গোড় পড়ে আছে। কিন্তু তখন তার রহস্য ভেদ করবার ইচ্ছা আমার একটুও হ'ল না! পাশ দিয়ে আরও হাত-দুই-তিন ওপরে উঠে নিরাপদ জায়গায় পা দিয়ে, একবার প্রাণ ভরে ভগবানকে ধন্যবাদ দিলুম।

তারপরই ছুট্‌লুম শক্তিধরের খোঁজে—কিন্তু কোথায়?

ছয়

বেলা তখন পড়ে এসেছে। বনের তলায় অন্ধকার গাঢ় হয়ে এল। গাছ ও লতা-পাতার তলা থেকে জোনাকীর ঝাঁক পিট্-পিট্ করে বেরিয়ে পড়েছে। আমি লক্ষ্যহীনের মত শক্তিধরের খোঁজে চলেছি। বার-কয়েক তার নাম ধরে ডাকলুম! বার-দুই বন্দুকের আওয়াজ করলুম। কিন্তু তার প্রতিধ্বনি ফিরে এল মাত্র। প্রতি পায়ে মনে হতে লাগল, সেই ক্ষেপা হাতী দুটোর সঙ্গে বুঝি দেখা হয়! তবুও যেদিক থেকে তারা আমাদের তাড়া করেছিল, সেইদিক পানেই চলতে লাগলুম।

প্রায় মাইল-খানেক চলবার পর বাঁ-দিক থেকে একটা খুব চাপা কাতরধ্বনি কাণে এল। স্থির হয়ে দাঁড়ালুম, আবার যদি শুনতে পাই। কিন্তু প্রায় মিনিট-দশেক কেটে গেল, শব্দটা আর শুনতে পেলুম না। হাত-আষ্টেক দূরে এগিয়ে যেতেই শব্দটা আবার শোনা গেল;—এবার যেন একটু স্পষ্ট, তবুও সেটা যে কিসের শব্দ, বুঝে উঠতে পারলুম না। আবার স্থির হয়ে কাণ পেতে দাঁড়ালুম। কিন্তু নিস্তব্ধ বনের মাঝে কেবল ঝিঁ-ঝিঁগুলোর ঝাঁ-ঝাঁ ও পাতার ফাঁকে-ফাঁকে বাতাসের মৃদু সর্‌সরানি ছাড়া আর কিছু শুনতে পেলুম না। হয়ত মনের ভুল ভেবে সামনে এগোতেই আবার সেই শব্দটা উঠ্‌ল। এবার খুব ঘন-ঘন—"ওঃ—ওঃ—ওঃ!" তারপরই থেমে গেল! মনে হ'ল, শব্দটা যেন মাটি ভেদ করে উঠ্‌ছে! কিন্তু কোন্ দিকে অনুমান করতে পারলুম না। অন্ধকারটা ততক্ষণে আরও গাঢ় হয়ে এসেছে। গাছপালার চেহারা তাতে চুপ্‌সে যেতে লাগ্‌ল।

আমি কাণ পেতে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। ক্ষণিক পরেই আবার সেই—"ওঃ—ওঃ—ওঃ!" শব্দটা আর-একটু স্পষ্ট। মনে হ'ল, ঠিক আমার বাঁ-দিক থেকে উঠ্‌ছে। খুব সন্তর্পণে সেদিকে কয়েক পা এগিয়ে যেতে-যেতে শুনলুম, সমুখের মাটি ভেদ করে গাছপালার মধ্য দিয়ে শব্দটা উঠে এল, "আঃ—উঃ!" সেটা যে মানুষের কাতরধ্বনি, তাতে আমার কোন সন্দেহ রইল না। আর, সে মানুষটি নিশ্চয়ই শক্তিধর। কিন্তু মাটির মধ্য থেকে সে অমন কাতরধ্বনি করবে কেন? সেখান থেকেই তার নাম ধরে চীৎকার করে ডাকলুম,—"শক্তিধর! শক্তিধর!"

মাটির মধ্য থেকে চাপা উত্তর এল,—"কর্ত্তা—"

"কোথায় তুমি?"

"বাঘের গর্ত্তে।"

"বাঘের গর্ত্তে!" আমি তাড়াতাড়ি পকেট থেকে দেশলাইট বার করে জ্বেলে দেখলুম, সমুখে একটা জায়গায় আধশুকনো ডালপালা বিছানো; তার মাঝে ছোট একটা ফাঁক। তার বেশী আর কিছু দেখ্‌বার আগেই কাঠিটা নিভে গেল। তাড়াতাড়ি আর-একটা কাঠি জ্বেলে, একটা গাছের গোড়ায় শুক্‌নো পাতা ও ছোট-ছোট ডাল ছিল, তাতে আগুন ধরিয়ে দিলুম। সেই আলোর সাহায্যে জায়গাটার ডালপালাগুলো সরাতেই একটা ইঁদারার মত গর্ত্ত বেরিয়ে পড়ল। ছোট একটা জ্বলন্ত ডাল উঁচু করে গর্ত্তের ধারে দাঁড়িয়ে নীচের দিকে তাকিয়ে দেখি, খুব অস্পষ্টভাবে কি যেন দেখা যাচ্ছে! সম্ভবতঃ শক্তিধরকেই। সে বল্লে,—"কর্ত্তা, জল!"

কোমরে জলভরা বোতল ছিল। হ্যাভারস্যাক থেকে দড়ি বার করে, তাতে ঝুলিয়ে সেটা তার কাছে নামিয়ে দিলুম।

জিজ্ঞাসা করলুম,—"শক্তিধর, উঠে আসতে পারবে? গর্ত্তটা কি খুব গভীর?"

সে অতি কষ্টে উত্তর দিল,—"হাত দুখানা বাঘের কামড়ে একেবারে জখম হয়ে গেছে,—গর্ত্তটা বিশ-পঁচিশ হাত হবে—"

"বাঘ? ওখানে বাঘ কি করে এল?"

"এটা বাঘ ধরবার ফাঁদ। হাতী দুটোর সামনে ছুটতে-ছুটতে আমি বাঁ-দিকের একটা ঝোপের মধ্যে ঢুকে পড়ি। তারপর সেখান থেকে কিছু দূর ছুটে গিয়েই এই চোরা-গর্ত্তের মধ্যে পড়ে যাই—একেবারে বাঘটার ঘাড়ের ওপর। তারপর কর্ত্তা, আমাদের দু'জনের মধ্যে যে লড়াই হ'ল, তার কথা আর কি বলব? আমার টাঙ্গিখানা বাঘটার মাথায় গেঁথে আছে; আমারও হাত দুখানা, ডান দিকের পাঁজরাটা আর নেই। বাঘটা তখনই মরে গেছে—আমিও আর বাঁচব না কর্ত্তা—" বলে শক্তিধর কাতর শব্দ করে উঠ্‌ল।

আমি তাকে সাহস দিয়ে বল্লুম,—"ভয় কি ভাই? তোমাকে সুস্থ করে তুলবই।" কিন্তু কি উপায়ে যে তাকে আরোগ্য করে তুল্‌ব ভেবে পেলুম না। তা ছাড়া, শক্তিধরকে ওপরে তোলবারও কোন ফন্দী মাথায় এল না। তবে একটা কথায় একটু আশ্বস্ত হলুম—এখানে যখন বাঘ ধরবার গর্ত্ত আছে, তখন নিশ্চয়ই-ক্রোশ-খানেকের মধ্যে মানুষও বাস করে। তারা হয়ত কাল সকালে বাঘের খোঁজে গর্ত্তটার ধারে আসবে। তাদের কাছ থেকে সাহায্য পাওয়া অসম্ভবও নয়। কিন্তু শক্তিধরের যথার্থ অবস্থাটা একবার দেখা দরকার।
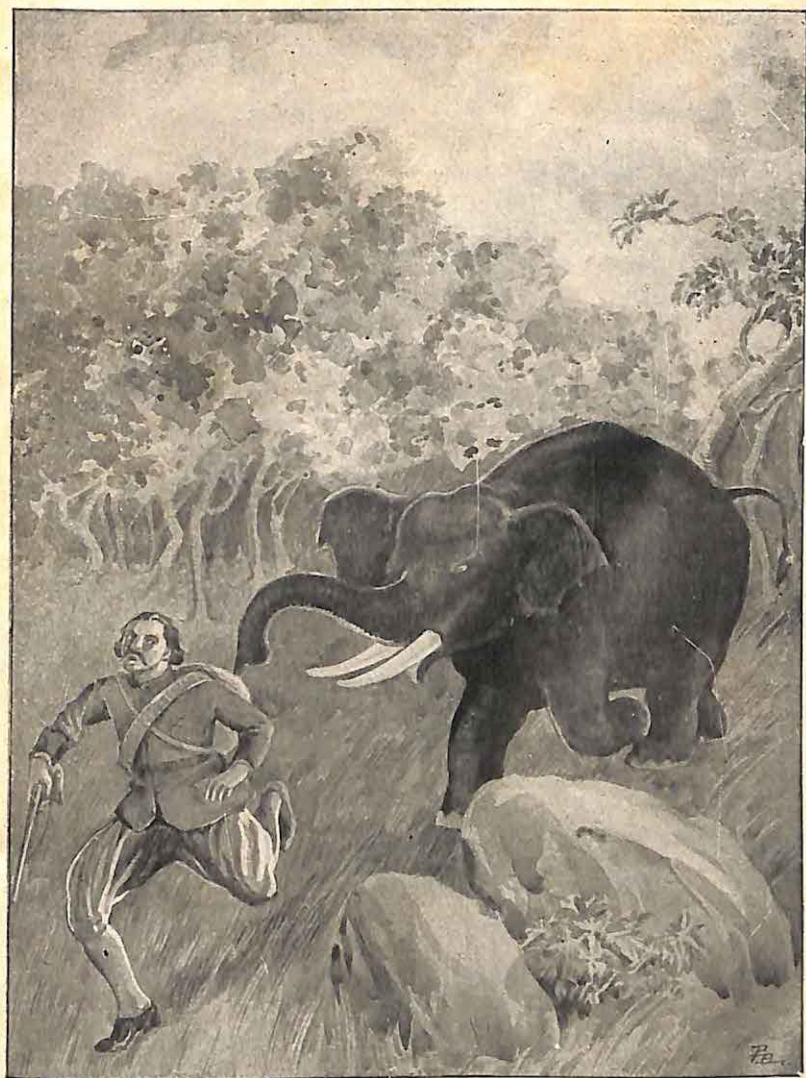
গুলি বন্দুকেই রয়ে গেল···পিছন ফিরে উর্দ্ধশ্বাসে ছুট্‌লুম।
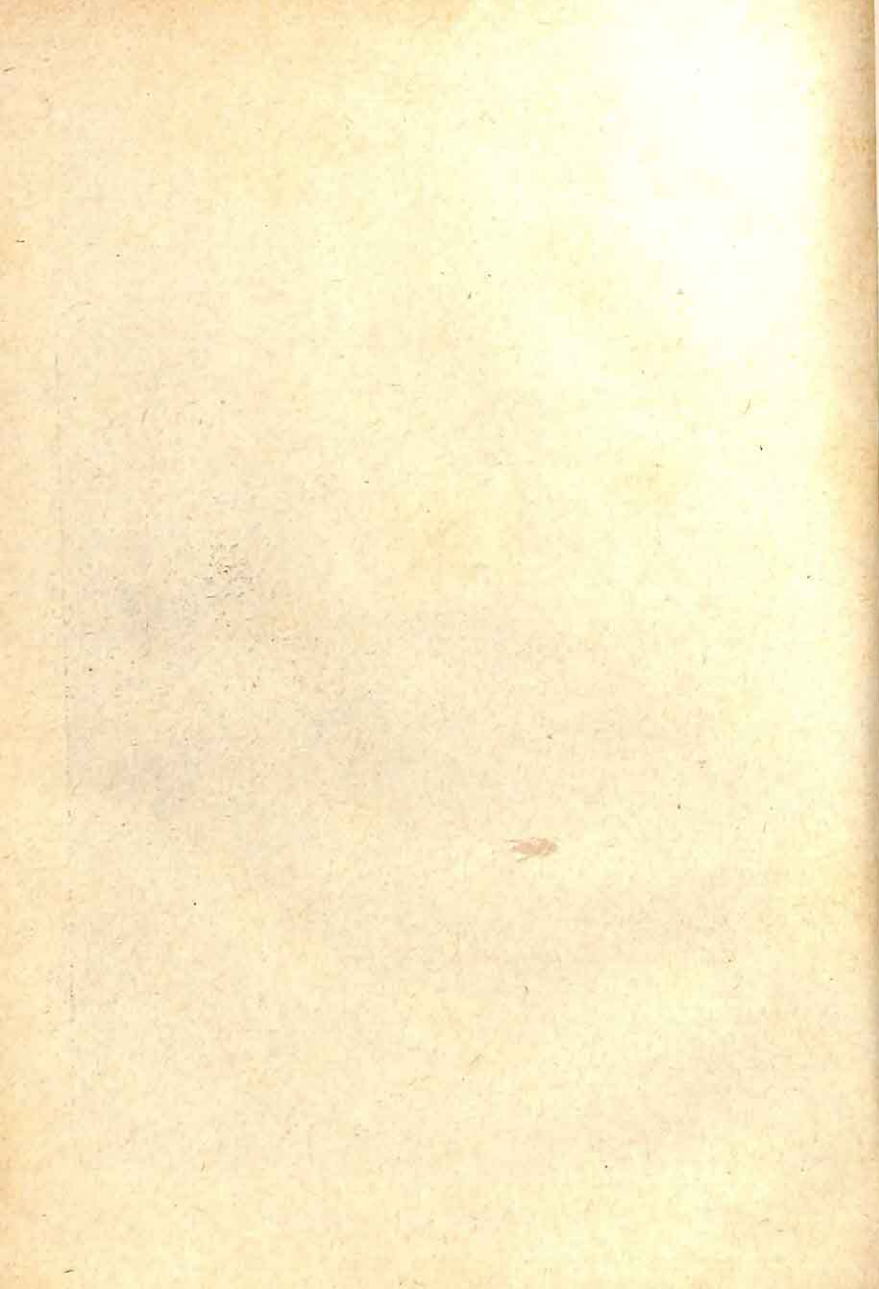
ওপরে দাঁড়িয়ে গর্ত্তের মুখে জ্বলন্ত ডাল উঁচু করে ধরে দেখা সহজ নয় এবং তা শক্তিধরের পক্ষে বিপদের। তার গায়ে জ্বলন্ত কাঠের টুকরো পড়তে পারে। নীচে নেমে গেলে অন্ধকারে তার ঘাড়ের ওপর পড়তে পারি ; আবার নামলে, ওঠাও মুস্কিল হবে। পকেট থেকে রুমালখানা টেনে নিয়ে ঝোলার মত করে জোনাকী ধরে-ধরে তার মধ্যে পূরতে লাগলুম। প্রায় শ'খানেক জোনাকী ধরে ঝোলার মুখটা বন্ধ করে দিলুম। তারপর জলের বোতলটা তুলে নিয়ে, দড়ি বেঁধে ঝোলাটা শক্তিধরের কাছে নামিয়ে দিলুম। রুমালের ভিতর থেকে জোনাকীগুলো পিট্-পিট্ করে আলো দিতে লাগ্‌ল। কিন্তু দাঁড়িয়ে তেমন ভাল করে গর্ত্তের তলাটা দেখা গেল না।

গর্ত্তের ধারে উপুড় হয়ে শুয়ে শরীরের অর্দ্ধেক নামিয়ে নিয়ে আব্‌ছায়া আলোয় দেখলুম, শক্তিধর বাঘটার পেটের ওপর মাথা দিয়ে কাৎ হয়ে পড়ে আছে। তার হাতখানা রক্তাক্ত ও ক্ষতবিক্ষত। সে একবার মাথা তুলে আলোটার দিকে তাকাল। তারপর ঘাড় ঘুরিয়ে ওপর পানে আমাকে দেখবার চেষ্টা করল।

এদিকে এই ব্যাপার চল্‌ছে। হঠাৎ গর্ত্তের আর-এক ধার থেকে বাঘের গর্জ্জন উঠল। রাইফেলটা পাশেই পড়ে ছিল। ক্ষিপ্র হাতে সেটা তুলে নিয়ে চট্ করে দাঁড়িয়েই দেখি, কিছুদূরে একটা হরিণের ঘাড়ের ওপর বাঘটা লাফিয়ে পড়েছে। তারপর নিমেষের মধ্যে সেটাকে মুখে করে বনের অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। আগুনটা তখন প্রায় নিভে এসেছিল। আমি আরও কতকগুলো শুক্‌নো পাতা ও মোটা-গাছের গুঁড়ি ফেলে আগুনটা উস্কে দিলুম।

কিছুক্ষণ না যেতেই আবার যেন দুটো কোন্ প্রাণী নক্ষত্র-বেগে কিছুদূর দিয়ে ছুটে গেল! দূর থেকে হায়েনার অট্টহাসি ভেসে আসে। আর-একবার বাঘের ডাক শোনা গেল। আমি টোটাভরা রাইফেলটা হাতে নিয়ে সেই গর্ত্তের ধারে আগুনের পাশে বসে সারারাত শক্তি-ধরকে পাহারা দিতে লাগ্লুম, যদি কোন প্রাণী আবার তার মধ্যে পড়ে।

শরীর ক্লান্ত হলেও সে-রাতে কিছুই খেতে ইচ্ছে হ'ল না।

সাত

পরদিন ভোর হতেই হৈ-হৈ শব্দে তীর-ধনুক হাতে একদল জংলী এসে হাজির। তারা গর্ত্তের কাছে আমায় দেখে অবাক্। দু'চার কথায় তাদের সঙ্গে বেশ আলাপ হয়ে গেল। তাদের জন-চারেক তৎক্ষণাৎ নীচে নেমে গিয়ে এক আশ্চর্য্য কৌশলে শক্তিধরকে প্রথমে ওপরে তুল্‌লে। তারপর বাঘটাকে ওপরে নিয়ে এসে তার চারধারে ঘুরে-ঘুরে নাচ সুরু করে দিলে। বেচারা শক্তিধরের তখন একটুও জ্ঞান ছিল না। তার বলিষ্ঠ হাত দুখানার পেশী ছিঁড়ে গেছে। পাঁজরায় নখের গভীর দাগ। ক্ষতগুলির চারিধারে রক্ত শুকিয়ে ডেলা বেঁধে রয়েছে। এতবড় বাঘকে যে সে শেষ করতে পেরেছে, এর জন্য তার প্রতি আমার মনে সম্ভ্রমের উদয় হ'ল। জংলীরা বল্লে,—"কাছেই গাঁ—মাত্র দু' ক্রোশ যেতে হবে। মাঝে একটা নদী পড়ে।"

তখন আর একতিল সময়ও নষ্ট করা চলে না। তাড়াতাড়ি গাছের কয়েকটা ডাল কেটে একটা মাচার মত তৈরী করে, শক্তিধরকে তার ওপর শুইয়ে দিলুম। জংলীদের চারজন স্বেচ্ছায় তাকে কাঁধে তুলে নিলে। বাকী সকলে আগে-আগে চল্‌তে লাগ্‌ল—তাদের মধ্য থেকে জন-কয়েক আবার আরও এগিয়ে গেল—আমি রইলুম সকলের পিছনে।

গভীর বন। প্রায় ক্রোশ-খানেক চলবার পর সকলের আগে যে জংলীরা ছিল, তারা ছুটতে-ছুট্‌তে এসে বল্লে,—"হাতীর পাল। হাতী-গুলো এইদিকেই আসছে।"

তাদের কথা শেষ হতে না হতে সমুখ থেকে তীক্ষ্ণ একটা শব্দ উঠ্‌ল। জংলীরা আর কেউ দাঁড়াল না—ছত্রাকারে চারিদিকে ছুট্‌ দিলে। তারা শক্তিধরকে কাঁধে নিয়ে চল্‌ছিল, তারাও তাকে তৎক্ষণাৎ কাঁধ থেকে নামিয়ে ফেলে সঙ্গীদের অনুসরণ করলে। দুটো জংলী আবার কিছুদূরে একটা শালগাছে চড়ে হাতীদের ওপর তীর চালাতে লাগ্‌ল।

হাতীর পাল হয়ত নিঃশব্দে সরেই যেত। এতে তারা উত্ত্যক্ত হয়ে উঠ্‌ল। একটা দেঁতোর গায়ে তীর লাগায় সে ক্ষিপ্তের মত আমাদের দিকে ছুটে আসতে লাগল। তখন নিজের প্রাণের চেয়ে, শক্তিধরকে রক্ষা করার চিন্তাই আমার মনে প্রবল। একা তাকে সরিয়ে নিয়ে যাবার উপায় নেই ; আবার সেখানে ফেলে রাখলে তার যেটুকু প্রাণ অবশিষ্ট আছে, হাতীর পায়ের চাপে তা বেরিয়ে যাবে। রাইফেলটা পরীক্ষা করে নিয়ে আমি তার দেহটাকে আড়াল করে স্থির হয়ে দাঁড়ালুম। সে রইল আমার পিছনে।

হাতীটাও সেই মুহূর্ত্তে গাছপালা ভেঙ্গে, লতাজাল ছিন্ন-ভিন্ন করে বেরিয়ে এল। তারপর হঠাৎ আমাকে দেখে একটু যেন চমকিত হ'ল। কিন্তু সে কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য। তারপর মাথা নেড়ে, শুঁড় তুলে, চীৎকার করে তেড়ে আস্‌তে লাগ্‌ল। আমি তার রগ লক্ষ্য করে পর-পর দুটি গুলি ছাড়লুম। সেও থমকে দাঁড়াল। সেই অবসরে আমার রাইফেলে আবার দুটো গুলি পোরা হয়ে গেছে। সে দুটো গুলি তার মগজে চালাতেই হাতীটা থর্‌-থর্‌ করে কেঁপে মাটিতে বসে, শুঁড় পাকিয়ে চোখ বন্ধ করলে! ঐ তার শেষ।

এই ব্যাপার শেষ হ'তে না হ'তে বনের ওধার থেকে হৈ-হৈ শব্দ

হতে লাগ্‌ল। মনে হ'ল, কারা যেন চারিদিকে ছোটাছুটি কর্‌ছে, মট্‌-মট্‌ শব্দে গাছের ডালপালা ভাঙ্গছে! শব্দটা ক্রমেই আমাদের দিকে এগিয়ে আস্‌তে লাগ্‌ল—আবার হাতী? মিনিট-খানেকের মধ্যে প্রকাণ্ড একটা দেঁতো হাতী আমার পাশের জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এল। তার শুঁড়ে একটা জংলী। জংলীটাকে সে শুঁড়ে পাকিয়ে মাথার ওপর তুলে ধরেছে। চাপে বেচারার জিভ্‌টা বেরিয়ে পড়েছে, দুটি কষ বেয়ে রক্ত ঝর্‌ছে। হাতীটার গায়ে আট-দশটা তীর। তার শরীরও রক্তাক্ত। আমি গুলি করবার আগেই হাতীটা একপাশে ঘুরে গেল। তার পর একটা শালগাছের গুঁড়িতে জংলীটাকে বার-বার আছড়াতে লাগ্‌ল। সে এক লোমহর্ষণ দৃশ্য! অবশ্য আমিও এর প্রতিশোধ নিলুম। তিনটি গুলিতে তাকেও সেই গাছের তলায় লুটিয়ে পড়তে হ'ল।

তারপর নদী পার হয়ে আমরা যখন সেই গাঁয়ে পৌছলুম, তখন বেলা অনেক। শক্তিধরেরও জ্ঞান ফিরে এসেছে। কিন্তু জীবনের আশা খুবই কম। ডাক্তার-বৈদ্য সে গাঁয়ের বিশ ক্রোশের মধ্যে নেই। কাজেই তাকে জংলীদেরই চিকিৎসাধীনে রাখতে হ'ল। কিন্তু"—বলেই মিঃ ফরেস্টার ক্ষণিক চুপ করে রইলেন। তারপর খুব আস্তে আস্তে বল্লেন, —"সে বাঁচ্‌ল না। তিনদিন পরে মারা গেল। আমাদের বিশ্বাসী পুরাতন ভৃত্য, আমার সঙ্গী"—বল্‌তে-বল্‌তে মিঃ ফরেস্টারের চোখ দুটো ছল্‌-ছল্‌ করে উঠ্‌ল।

"মিঃ ফরেস্টার, তারপর?"

"তারপর সেই গাঁয়েই থাকি। তার চারধারের জঙ্গলে ও পাহাড়ে-পাহাড়ে ঘুরে বেড়াই। মাঝে-মাঝে শিকার করি—কখনও

একদিনের পথে, কখনও-বা দু'দিনের পথে। আর কোথাও যেতেও ইচ্ছে হয় না। গাঁয়ের সর্দ্দারও আমায় খুব খাতির-যত্ন করে।

সর্দ্দারের গোটা-কয়েক শিকারী কুকুর ছিল। কুকুরগুলো আকারে তেমন বড় নয়। কিন্তু সেগুলো যেমন তেজী, তেমনি ছিল শিকারে পটু। কয়েকদিনের মধ্যেই একটা কুকুর আমার খুব বশ হয়ে পড়ল। মাঝে-মাঝে আমার সঙ্গে শিকারে যায়, রাত্রে আমার পায়ের কাছে শুয়ে থাকে। সাধারণতঃ পাখী শিকার করবার সময় আমি সেটাকে সঙ্গে নিতুম।

ঐ অঞ্চলটার জলাশয়গুলো অনেকটা ঝিলের মত। সকাল-সন্ধ্যায় তার ধারে নানারকম পাখী বসে—হাঁস, জলমুরগী, কাদাখোঁচা, তিতির। চারিদিকের জমি উঁচু-নীচু ও বনজঙ্গলে ভরা। সেদিন দুপুরের দিকে কুকুরটাকে সঙ্গে নিয়ে, গাঁ থেকে মাইলখানেক দূরে একটা ঝিলের ধারে বেড়াতে গেছি। ঝিলটার একধারে ছোট একটা পাহাড়। সঙ্গে অস্ত্রের মধ্যে কেবল একখানি ছোরা ও একখানি মোটা লাঠি। শিকারের ইচ্ছা সেদিন আমার একেবারেই ছিল না। দিনের বেলা, তার ওপর গাঁয়ের এত কাছে! ওখানে যে কোন হিংস্র জন্তু আছে, এ-কথাও শুনিনি। কাজেই বেশ নিশ্চিন্ত আছি।

ঘুর্‌তে-ঘুর্‌তে সেই পাহাড়টার নীচে একটা শালগাছের ছায়ায় একখানা পাথরের ওপর গিয়ে বসলুম। সমুখে ঝিল। তার একধারে প্রায় হাজার-দুই হাঁস। জায়গাটা কালো হয়ে আছে। কুকুরটা পিছিয়ে পড়েছিল! হঠাৎ পিছনে একটা শব্দ হতেই দেখি, আমার কাছ থেকে হাতকয়েক দূরে দু'খানা পাথরের ফাঁকে একটা ভালুকের বাচ্চা। বাচ্চাটা আমাকে দেখেই ফাঁকটার মধ্যে সেঁধিয়ে

গেল। তারপরই তার পাশের জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এল একটা ভালুক! ওদের মা।

ভালুকটা এমন হঠাৎ আমায় আক্রমণ করলে যে, প্রথমটা আমি বেশ একটু ভড়্কে গেলুম। তার নাক লক্ষ্য করে লাঠিখানা চালালুম বটে, কিন্তু সেটা গিয়ে পড়ল তার পাঁজরায়। মানুষ হ'লে নিশ্চয় সে আঘাতে পাঁজরার দু-একখানা হাড় ভেঙে যেত। ভালুকটা কিন্তু তাতে কাতর হওয়া ত দূরের কথা, আরও ক্ষেপে উঠল। ছুটে এসে আমার হাতের ওপর প্রচণ্ড এক চড় লাগাল। এই দেখুন, আমার বাঁ হাতের কব্জীর সে আঘাতের দাগ এখনও আছে।

আমি কোমর থেকে ছোরাখানা খুলবারও সুযোগ পেলুম না। কয়েক পা পিছিয়ে যেতেই পিছনে যে পাথরখানা ছিল তার ওপর পড়ে গেলুম। এ অবস্থায় আপনারা কি করতেন জানি না। আমি ত প্রাণের আশা ছেড়ে দিলুম। কেননা, চট্ করে যে উঠে দাঁড়াব সে-উপায় আমার নেই। দুপাশে ছোট ছোট তীক্ষ্ণ পাথর। তবুও কনুইয়ে ভর দিয়ে একপাশে কাৎ হয়ে ওঠবার চেষ্টা করছি, এমন সময় দেখি, কুকুরটা কোথা থেকে যেন ছুটে এসে ভালুকটার পিছনের একখানা পা কাম্ড়ে ধরেছে!

ভালুকটা এর জন্য প্রস্তুত ছিল না। তার রকম দেখে মনে হ'ল, বেশ একটু আশ্চর্য্য হয়ে গেছে। সে-ভাবটা কাটিয়ে সে নিমেষে পিছনের দিকে ঘুরে দাঁড়াল, আমিও সেই অবসরে উঠে দাঁড়িয়ে কোমর থেকে ছোরাখানা খুলে নিলুম। মনে করলুম, এবার কুকুর ও ভালুকেই যুদ্ধ হবে। কিন্তু কুকুরটার মুখ থেকে পা-খানা ছাড়িয়ে নিয়ে ভালুকটা আবার আমাকেই আক্রমণ করলে। কুকুরটা আবার

তার আর-একখানা পা কাম্‌ড়ে ধরলে। আবার সে ফিরে দাঁড়াল। এমন করে সে যতবার আমাকে আক্রমণ করতে আসে, কুকুরটা তাকে বাধা দেয়। শেষকালে সে আমাকে ছেড়ে দিয়ে কুকুরটাকে আক্রমণ করলে।

কিন্তু কুকুরটা তার সঙ্গে সম্মুখ-যুদ্ধ না করে একদিকে সোজা দৌড় দিলে। ভালুকটাও তার পিছনে ছুট্‌ল। আমিও সুবিধা পেয়ে কুকুরটাকে ডাকতে ডাকতে গাঁয়ের দিকে ছুট্‌তে লাগলুম। ছুট্‌তে ছুট্‌তে কিছুদূরে গিয়ে ফিরে দেখলুম, ভালুকটা সে-জায়গায় ফিরে যাচ্ছে, আর কুকুরটা দৌড়চ্ছে ঝিলের ওপার দিয়ে। এ ব্যাপারে আশ্চর্য্য হয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে সেই পাথরগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখি, একটা চিতাবাঘ ভালুকের একটা বাচ্চা মুখে করে একলাফে বনের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। এত অল্প সময়ে এমন একটা কাণ্ড ঘটে গেল যে, আমি আজও সেটা ভুলতে পারি নি।

ভালুকটা সেখানে কি করে দেখবার সুযোগ আর হ'ল না। আমার হাতের ক্ষত দিয়ে তখনও রক্ত ঝরছে; যন্ত্রণাও হচ্ছিল খুব। আমার দৌড়বার আর শক্তি ছিল না। আর, তার দরকারই বা ছিল কি? অবশ্য প্রাণের ভয় থাকলে যে দৌড়তুম, তা নিশ্চয়। কুকুরটা হাঁপাতে হাঁপাতে আমার কাছে এসে দাঁড়াতে তাকে সঙ্গে করে গাঁয়ের দিকে চলতে লাগলুম। সে লড়াই করে ক্লান্ত হ'লেও শরীরের কোথাও জখম হয় নি। কিন্তু ভালুকটার ক্ষতর রক্ত তার দাঁত, জিভ ও ঠোঁট দুখানা লাল করে ফেলেছিল।

তারপর আমরা যখন গাঁয়ে ফিরলুম, তখনও বেলা পড়ে নি। সেদিন থেকে সপ্তাহ দুই কোথাও শিকারে না গিয়ে গাঁয়ে বিশ্রাম

করতে লাগলুম। কেননা, হাতখানা খুব জখম না হ'লেও বন্দুক ধরবার মত অবস্থা তার ছিল না। তারপর হাতখানা ভাল হয়ে গেলে শিকারে বার হ'তে লাগলুম। কিন্তু সেদিন থেকে প্রতিজ্ঞা করেছিলুম, বনরাজ্যে আর কখনও অস্ত্রহীন হয়ে কোথাও যাব না। তারপরও আবার যখন শিকারে বার হ'তে লাগলুম, গাঁয়ের চারধারে বড় বড় ঝিলগুলো ছাড়া আর বেশী দূরে গেলুম না। সেখানেই পাখী শিকার করি, কোন দিন হু'তিনটে গাছের গুঁড়ি একসঙ্গে দড়ি দিয়ে বেঁধে কুকুরটাকে পাশে বসিয়ে ঝিলের ওপর ভেসে বেড়াই।

একদিন ঠিক করলুম, ভেলায় বসে বড় জানোয়ার—বাঘ, হাতী কি গণ্ডার—শিকার করব। গাঁয়ের সর্দ্দারও আমার কথায় সায় দিলে। গাঁ থেকে ক্রোশ দেড়েক দূরে একটা প্রকাণ্ড ঝিল ছিল। তার চারধারে বন-জঙ্গল খুব ঘন। শুনলুম, সেখানে প্রায়ই বাঘ জল খেতে আসে। কখনও কখনও হাতীর পালও আস্‌ত। ঐ জায়গাটাই শিকারের বেশ উপযুক্ত। সেদিন আবার সকাল থেকে আকাশে মেঘ দেখা দিয়েছিল। সূর্য্য সকালের দিকে একবার দেখা দিয়ে চারদিক অন্ধকার করে মেঘের আড়ালে লুকিয়ে গেছে। এমনি দিন আমার খুব ভাল লাগে। বাঘ-ভালুকও মনের আনন্দে বনের মধ্যে শিকারের সন্ধানে ঘুরে বেড়ায়।

সর্দ্দার আমাকে শিকারে যেতে বারণ করলে। কিন্তু আমার জেদ প্রবল হয়ে উঠ্‌ল। অগত্যা আমার কথামত সে লোকজন দিয়ে চারটে মোটা গুঁড়ি জোগাড় করে সেই ঝিলের ধারে নিয়ে গিয়ে খুব শক্ত দড়ি দিয়ে বেঁধে ভাসিয়ে দিলে। তার ওপরে চারধারে থাকল গাছপালার বেড়া। সেই বেড়াটার আড়ালে বসলে

শিকার শিকারীকে সহজে দেখতে পায় না;—মনে করে জলের ওপর গাছপালা ভাসছে।

সর্দ্দারের ইচ্ছা ছিল সেও আমার সঙ্গে শিকারে যায়। তাকে সঙ্গে নিলে হয়ত কিছু সুবিধাও হ'ত। কিন্তু তার সঙ্গ আমার ভাল লাগছিল না বলে আমি একা শেষবেলার দিকে অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে সেই ঝিলের ধারে রওনা হলুম। সঙ্গে কিছু খাবারও নিয়েছিলুম। আগেই বলেছি, ওদিককার জলাগুলো ঝিলের মত দেখতে; তাই সেগুলোকে ঝিল বলাই ঠিক। এই ঝিলটা লম্বায় প্রায় সিকি মাইল আর চওড়ায় প্রায় তিন শো হাত হবে। ধনুকের মত বেঁকে উত্তরে ও দক্ষিণে চলে গেছে। কাজেই এক দিক থেকে আর-এক দিক দেখা যায় না।

আমি ভেলায় উঠে সেখানা ভাসিয়ে দিলুম। ছোট একখানা বৈঠাও ছিল। মেঘলা থাকায় বাতাসও বইছিল এলোমেলো, আর একটু জোরে। অল্পক্ষণের মধ্যেই একেবারে মাঝখানে এসে পড়লুম। অন্ধকারও একটু একটু করে গাঢ় হয়ে এল। তীরের গাছপালার চেহারা হয়ে উঠ্‌ল যেন এক-একটা ভয়ঙ্কর দৈত্য! হাওয়ায় আবার সেগুলো মাথা দুলিয়ে সর্ সর্ শব্দে চারিদিক ভরে তুলছে। দৃশ্যটা আমার মন্দ লাগছিল না। ভেলার ওপর চুপ করে বসে সেই বেড়ার মধ্য দিয়ে তীরের দিকে তাকিয়ে আছি। বিশেষ করে আমার লক্ষ্য বাঁ-দিকে। সেই দিকেই কাদায় বাঘের থাবার দাগ দেখেছিলুম।

ক্রমে সন্ধ্যা উত্‌রে গেল। তবুও বাঘের দেখা নেই। এদিকে অমন হাওয়াতেও তীর থেকে মশার ঝাঁক উড়ে এসে আমার

চারধারে গুঞ্জন তুলেছে! তাদের কামড়ে এক দণ্ড এক জায়গায় স্থির হয়ে বসে, কার সাধ্য? এক-একবার মনে হ'তে লাগ্‌ল, কাজ নাই আমার শিকারে, গাঁয়ে ফিরে যাই! কিন্তু অন্ধকার বনের মধ্য দিয়ে পথ চিনে যাওয়া সহজ নয়। পথের ভুল ত হবেই; তার ওপর কোন্ জানোয়ারের হাতে পড়ব ঠিক কি? তাই রুমাল ঘুরিয়ে মশা তাড়াবার চেষ্টা করতে লাগলুম। হঠাৎ চোখে পড়ল, ডান দিকের তীরে ঝোপের ধারে দুটো আগুনের টুক্‌রো! তার কাছ থেকে একটু দূরে আরও দুটো। বুঝতে বাকী রইল না সেগুলো আসলে—বাঘের জ্বলন্ত চোখ!

বাঘ দুটো এদিকে ওদিকে তাকাচ্ছে। জলের ধারে একটু এগিয়ে আসছে আবার সরে যাচ্ছে। বার-কয়েক এমনি করে তাদের ধারণা হ'ল, কাছে কিনারে কোন শত্রু নেই। তারপর ঝিলের কিনারে এসে নিশ্চিন্ত মনে চক্ চক্ শব্দে জলপান সুরু করলে। আমিও আর দেরী না করে একটার চোখ লক্ষ্য করে গুলি ছুড়লুম। গুলিটা তার কোথায় লাগ্‌ল বুঝতে পারলুম না, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে উঠ্‌ল এক প্রচণ্ড হাঁক! সেখানকার বন-জঙ্গলের মধ্যে একটা ধ্বস্তাধ্বস্তি সুরু হ'ল। তারপরই সব চুপচাপ। যেন কিছুই হয়নি! বাঘটা সেখানে আছে কিনা জানবার কোন উপায়ও নেই। অন্ধকার রাত, তার ওপর আহত বাঘ। ওর চেয়ে ভয়ঙ্কর আর কি আছে বলুন? আমি চুপ করে ভেলার ওপর বসে রইলুম।

কিন্তু কপালে আমার সেদিন দুর্ভোগ আছে। ঝম্ ঝম্ শব্দে বৃষ্টি সুরু হ'ল, ঐ সঙ্গে প্রবল ঝড়। তার টানে ভেলাখানা ডানদিকের তীরের কাছে সরে যেতে লাগ্‌ল। বৈঠা দিয়ে যত মাঝ-

ঝিলে যাবার চেষ্টা করি, ঝড়ের ধাক্কায় ততই সেখানা কূলের দিকে এগিয়ে যায়। ব্যাপার দেখে মনে হ'তে লাগ্‌ল, কে যেন জোর করে আমাকে সেদিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। আমার সাধ্য নেই যে তার হাত থেকে নিস্তার পাই। বৃষ্টিধারা তীরের মত আমার চোখে-মুখে বিঁধছে। মাঝে মাঝে বিদ্যুতের চমকে চোখ ধেঁধে যায়। তবুও আমি মাঝখানে থাকবার চেষ্টা করতে লাগলুম। কিন্তু ঝড়ের সঙ্গে কতক্ষণ পারব? এক-এক দমকায় ভেলাখানা তীরের দিকে সরে আসে। শেষে একেবারে তীরে একটা ঝোপের নীচে এসে ঠেকল। তখন আর উপায় কি?

আমি রাইফেল হাতে ভেলার ওপর প্রস্তুত হয়ে রইলুম, যদি কোন হিংস্র জন্তু আসে! এদিকে বৃষ্টি ও ঝড়ের বিরাম নেই। কিছুক্ষণ সেই ভাবে কেটে গেল। হঠাৎ মনে হ'ল, সর্ সর্ করে কি যেন ভেলার ওপর উঠে আসছে! বিদ্যুতের আলোয় দেখলুম, চক্ চক্ করে উঠ্‌ল একটা মোটা সাপ। সাপটাও মাথা তুলে আমায় দেখছে। সাপের চোখ দেখেছেন ত? তার দিকে তাকালে সারা শরীর শিউরে ওঠে। তখন আমার নিরাপদ স্থান হ'ল জল। ডাঙ্গায় ঝোপের মধ্যে সেই আহত বাঘটা যে নেই, তা কি করে বলি? ভেলায় থাকলে সাপের মুখে নিশ্চয়ই প্রাণ যাবে। আবার জলে নামলে, কতক্ষণই বা সাঁতার দিয়ে ভেসে থাকতে পারব? একটা তীরে গিয়ে উঠতেই হবে। সেটাও নিরাপদ্ ও সহজ নয়। এমন অবস্থায় আপনারা কেউ পড়েছেন কোন দিন?"

ধীরেনবাবু ও মিঃ ব্রেকার একসঙ্গে বল্লেন—"না কেউ যে পড়েছেন তাও শুনি নি।"

মিঃ ফরেষ্টার বল্লেন—"সাপটা যে ক্রমে ভেলাখানা দখল করছে অন্ধকারেও এটা বেশ বুঝতে পারছিলুম। কোন্ মুহূর্ত্তে যে সে আমায় আক্রমণ করবে ঠিক নেই। ভেলার ওপর ফোঁস্ ফোঁস্ শব্দ হচ্ছে। তীরে গাছপালার মধ্য থেকে বাঘ ডেকে উঠ্ল।

সাঁতরে ঝিল পার হ'য়ে ওপারে উঠ্ব স্থির করে জলে ঝাঁপ দিতেই পা পিছলে, আমি পড়লুম জলে, আর আমার হাত থেকে রাইফেলটা পড়ল ভেলার ওপর। পড়েই সেটা আওয়াজ হয়ে গেল। গুলিটা বেরিয়ে সোঁ করে আমার মাথার ওপর দিয়ে গিয়ে লাগ্ল ওপারে একটা পাথরে! বিপদ্ যে তখন কেমন ঘোর হয়ে উঠ্ল, আপনারা বুঝতে পারছেন? ভেলার ওপর উঠে বা তার একপাশ থেকে হাত বাড়িয়ে রাইফেলটা তুলে নিতে গেলে সাপের মুখে মৃত্যু নিশ্চিত। কাজেই ভাগ্যে যা থাকে ভেবে কোমরে ছোরাখানা সম্বল করে ওপারের দিকে সাঁতরাতে লাগলুম।

বিদ্যুতের আলোয় ভিজে বনের ও ঝিলের অশান্ত মূর্ত্তি চোখের সামনে ফুটে উঠ্তে লাগল। বৃষ্টির জল একটু কমলেও বাতাসের বেগ তেমনি ছিল। বহুক্ষণ জলে ভিজে শরীরের মধ্যে অস্বস্তি বোধ হচ্ছিল। তার ওপর উত্তেজনা; খাওয়াও হয় নি। সাঁতার দিতে দিতে হাত-পা অবশ হ'য়ে আসছিল। নাকে, মুখে, চোখে ঢেউ লাগে। এক-একবার হাঁপিয়ে উঠি। তীর তখনও দূরে—মাঝ-ঝিলে আসতেই এই অবস্থা! এক-একবার মনে হ'তে লাগল, এ যাত্রায় আর নিস্তার নেই। জলে ডুবে, জ্বরে বা বাঘ-ভালুকের মুখেই প্রাণ যাবে। প্রাণপণে চেষ্টা করতে লাগলুম কোন রকমে যাতে ওপারে গিয়ে পৌছতে পারি। তারপর যা হয় হোক্!

সাঁতরাতে সাঁতরাতে কিছুদূর চলে এসে বিদ্যুতের আলোয় দেখলুম, সমুখে তীর থেকে কিছুদূরে জলের মধ্যে একখানা প্রকাণ্ড পাথর। আমি সেই পাথরখানার কাছেই সাঁতরে যেতে লাগলুম। কিন্তু পাথরখানার কাছে পৌঁছে তার ওপর ওঠবার স্থযোগ পেলুম না। শেওলায় ও বৃষ্টি-জলে সেটা এমন পিছল হয়ে আছে যে, হাত পিছলে যেতে লাগ্‌ল। অন্ততঃ সেদিকে তার গায়ে যে কোন খাঁজ আছে, তাও মনে হ'ল না।

সেদিক থেকে ঘুরে অন্য দিকে গিয়ে খানছুই ছোট পাথর দেখলুম। তার একখানার ওপর উঠে দাঁড়িয়ে বড় পাথরখানার ওপর হাত দিয়ে মনে হ'ল একজন লোক তার ওপর গুড়িশুড়ি হয়ে শুয়ে থাকতে পারে। কিন্তু সেখানে ওঠা খুব সহজ নয়। বিশেষ করে আমার পক্ষে ত নয়ই।

সেই ছোট পাথরখানার ওপর দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে, বহু কষ্টে বড়-পাথরখানার মাথায় উঠে বসলুম। তারপর ক্রমে বৃষ্টি ধরে এল, বাতাসের বেগও কমে এল, বনের মাথায় কৃষ্ণপক্ষের চাঁদও দেখা দিল। অবসন্ন দেহে সেখানে বসে থাকতে থাকতে ঘুমিয়ে পড়লুম।"···বলে মিঃ ফরেষ্টার চুপ করলেন।

তারপর বল্লেন—"কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলুম জানি নে। ঘুম ভাঙলে শুন্‌লুম ঘন ঘন কুকুর ডাকছে, লোকজন চীৎকার করছে। পূব আকাশ বেশ ফর্সা; আমার সারা শরীরে ব্যথা। আস্তে আস্তে মাথা তুলে দেখি, তীরে লোকজন ও কুকুর নিয়ে গাঁয়ের সর্দ্দার এসেছে। তারা আমায় খুঁজতে বেরিয়েছিল। শুয়ে শুয়েই দেখলুম, ওপার থেকে সেই ভেলাখানা একটা লোক বেয়ে নিয়ে আসছে। ভেলাখানা কাছে

আসতে তার ওপর নেমে বসলুম! দেখলুম রাইফেলটা তার ওপর পড়ে আছে। সাপটা নেই। সেটা হয়ত রাইফেলের শব্দে তৎক্ষণাৎ সরে পড়েছে। বাঘটার কি হ'ল জিজ্ঞাসা করবার আগেই দেখি, কয়েকজন মিলে একটা মরা বাঘকে বাঁশে ঝুলিয়ে কাঁধে করে নিয়ে আসছে। বাঘটাকে দেখে আমার এত পরিশ্রম ও কষ্ট সার্থক মনে হ'ল।

তারপর সপ্তাহখানেক বিশ্রাম নিলুম। সেদিনকার ব্যাপারে ভয় হয়েছিল অসুখে পড়ব, কিন্তু শেষ অবধি বেশ সুস্থ হয়ে গেলুম।

আবার একদিন খুব ভোরে উঠে বেরিয়ে পড়েছি দূরের পাহাড়গুলোর দিকে। সেদিন একটা নূতন পথ ধরে চল্‌তে লাগলুম। এ পথটার মাঝে মাঝে ছোট ছোট জলাশয়। সেগুলোর তীরে ঘন গাছপালা। দূর থেকে ঝরণার ঝর্‌-ঝর্‌ শব্দ কানে আসে।

প্রায় মাইল তিনেক চল্‌বার পর কেমন অস্বস্তি বোধ হ'তে লাগ্‌ল! গরমটাও তেমন ছিল না, শরীরও ভাল আছে, তবে এমন কেন হয়? স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে চারধারে তাকিয়ে দেখলুম, গভীর বন ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ল না। আবার চল্‌তে লাগলুম, আবার ঐ ভাব। এবার মনে হ'ল, আমার পিছনে পিছনে কি যেন অনুসরণ করছে! কয়েক পা পিছিয়ে গেলুম—তবুও কিছু দেখা যায় না। মনের ভুল মনে করে সামনে কয়েক হাত যেতেই পাশ থেকে কি যেন হুড়মুড় করে ছুটে গেল। আর ঐ সঙ্গে বাঘের হুঙ্কার উঠ্‌ল। আমি তৎক্ষণাৎ পিছনের দিকে লাফ দিয়ে সরে যেতেই সাম্‌নে এক ভয়ঙ্কর লড়াই সুরু হ'ল—বাঘ ও প্রকাণ্ড এক কালো গণ্ডারে।

গাছপালা ভেঙে, হুঙ্কার ছেড়ে, লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে মাটি ক্ষত-বিক্ষত

করে এই ভয়ঙ্কর প্রাণী দুটো লড়াই করতে লাগ্‌ল। বাঘটা প্রচণ্ড এক থাবায় গণ্ডারটার একটি চোখ উড়িয়ে দিলে। বাঘটারও শরীর গণ্ডারের খড়্গাঘাতে ক্ষত-বিক্ষত। যুদ্ধটা ক্রমেই ঘোর হ'য়ে উঠছে। হঠাৎ দেখলুম, বাঘটা গণ্ডারের পেটের তলায়। গণ্ডারটাও নিমেষে সরে দাঁড়াবার চেষ্টা করতেই তার স্থূল পায়ের একটি লাথি লেগে বাঘটা একপাশে ছিট্‌কে পড়ে গেল। কিন্তু আশ্চর্য্য তার ক্ষিপ্রতা! স্প্রীংয়ের মত লাফিয়ে উঠে হাঁক ছেড়ে আবার আক্রমণ করতেই গণ্ডারটার প্রকাণ্ড খড়্গাখানা তার পেটের মধ্যে সেঁধিয়ে গেল। গণ্ডারটা তাকে শূন্যে তুলে বনের মধ্য দিয়ে ছুট্‌তে লাগ্‌ল। আমিও তাদের পিছনে দৌড়তে লাগলুম।

কিন্তু বেশীদূর যেতে হ'ল না; একটা ছোট জলা পার হবার সময় বাঘটার প্রাণহীন দেহ তার খড়্গ থেকে জলের মধ্যে পড়ে গেল। জলাশয়টাতে জল ছিল হাঁটু সমান কিন্তু কাদা ছিল খুব। চওড়ায় সেটা হাত পঞ্চাশেক হবে। লম্বায় অনেকখানি—একটা ঝিল বল্‌লেই চলে। গণ্ডারটা জল-কাদা ভেঙ্গে ওপারে গিয়ে ওঠবার আগেই আমি তাকে গুলি করলুম। গুলিটা তার একটা কাণে গিয়ে লাগ্‌ল। তবুও তার ভ্রূক্ষেপ নেই—সে সমানে চল্‌তে লাগ্‌ল।

এমন একটা শিকার হাতছাড়া হয়ে যায়। আমি তাড়াতাড়ি জলাটার মধ্যে নেমে পারের দিকে ছুট্‌লুম। কিন্তু কাদায় পা দুটো ব'সে যেতে লাগ্‌ল। তবুও যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি মাঝ-বরাবর গিয়ে পৌঁছুতেই গণ্ডারটা হঠাৎ ফিরে দাঁড়াল। তারপর মাথা নীচু করে ফোঁস ফোঁস শব্দ করতে করতে জলার মধ্যে নেমে পড়ল।

বাকী গুলিটা তার চোখ লক্ষ্য করে তৎক্ষণাৎ ছুড়লুম বটে, কিন্তু গুলিটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হ'ল। গণ্ডারটা ততক্ষণে আমার সমুখে এসে পড়েছে। তার ছোটার বেগে জল-কাদা আমার চোখে-মুখে ছিট্‌কে এসে লাগ্‌ল। কাদায় চোখ ছুটো কর্ কর্ করে দৃষ্টি ঝাপ্‌সা হয়ে এল। নূতন গুলি পূরবার সময় তখন নেই। আমি সোজাসুজি না গিয়ে জলাটার ডান দিকে ছুট্‌তে লাগলুম। কিন্তু সেই কাদা ভেঙ্গে ছুটে পালানোও সহজ নয়। গণ্ডারটাও আমার পিছু নিয়েছে। একবার মনে হ'ল, আমার হ্যাভারসাকের ওপরে তার খড়্গটা একটু যেন ছুঁয়ে গেল। শীঘ্রই সেটা আমার পিঠ ভেদ করে বুকের মধ্য দিয়ে বার হবে। পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখলুম, আমাদের ছুজনের মধ্যে আর মাত্র হাত খানেক ব্যবধান! দেখতে দেখতে ওটুকুও থাকবে না। তখন—?

কিন্তু ভাগ্য আমার ওপর সুপ্রসন্ন। সেখান থেকেই জলাটা গভীর হয়েছে। চল্‌তে চল্‌তে ডুব-জলে গিয়ে পড়ে ডুবে হাত দশেক দূরে গিয়ে ভেসে উঠ্‌লুম। সাঁতরাতে সাঁতরাতে ফিরে দেখলুম, গণ্ডারটা সেখানে দাঁড়িয়ে আমাকে চারদিকে খুঁজছে। কিন্তু আমি তখন তার পাল্লার বাইরে।

এদিকে এই ব্যাপার চল্‌ছে। আবার যেদিকটা নিরাপদ মনে করে সাঁতরে উঠ্‌বো বলে এগিয়ে যাচ্ছি, সেদিকে নজর পড়তেই দেখি, পাথরের আড়াল থেকে আর একজন আমায় মনোযোগের সঙ্গে দেখছে। প্রথম সে আমার নজরে পড়ে নি। সেটিও একটি গণ্ডার। গণ্ডারটি ছোটখাট একটি হাতী বিশেষ, বোধ হয় এই গণ্ডারটারই জুড়িদার। আমাকে দেখেই সে ফোঁস্ করে একটি

নিশ্বাস ছাড়লে। তার ক্ষুদে ক্ষুদে চোখ দুটোতে দুষ্টুমি ফুটে উঠেছে—সে গম্ভীর ভাবে জলের দিকে হাত দুই এগিয়ে এল।

এরপর সেদিকেও ওঠা অসম্ভব। কিন্তু সাঁতার দিয়েও বেশীক্ষণ জলে ভেসে থাকা যাবে না। আমি অপর পারে উঠ্‌ব ভেবে ঘুরতেই দেখি, কাণকাটা গণ্ডারটা জল থেকে উঠে সেদিক দিয়ে আস্তে আস্তে বনের মধ্যে যাবার উদ্যোগ করছে। কয়েক পা গিয়ে সে আমার দিকে পিছন ফিরে দাঁড়াল। কতক্ষণ সে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকবে তারও ঠিক নেই। গুলি-বারুদ সব জলে ভিজে অকেজো হয়ে গেছে। হ্যাভারসাকটাও ভারী বোধ হ'তে লাগ্‌ল। এক হাতে রাইফেল থাকায় ভাল করে সাঁতারও দিতে পারছি না। ক্রমে হাত ভারী হয়ে আসছে। কম জলে গিয়ে যে দাঁড়াব, তারও উপায় নেই। তবুও সেটাই আমার রক্ষা পাবার একমাত্র পথ। চিৎ-সাঁতার দিয়ে সে-পারেই উঠ্‌লুম। শুনতে পেলুম, কারা যেন বনের মধ্যে চীৎকার করছে। গণ্ডার দুটোও সে শব্দের দিকে কাণ খাড়া করে থাকতে থাকতে পাথরের আড়ালে যেটা ছিল, বনের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। আর কাণকাটাটা তাড়াতাড়ি আবার জলের মধ্যে নেমে পারের দিকে ছুট্‌ল। কিন্তু মাঝ-পথে আমাকে দেখে হঠাৎ তাড়া করলে।

আবার গভীর জলে নেমে পড়লুম। কিন্তু এবার আর সে দাঁড়াল না, পারে উঠে বনের মধ্যে চলে গেল। আমিও তৎক্ষণাৎ এপারে উঠে পড়লুম। তবুও কিন্তু বিপদের শেষ হ'ল না।

———

আট

বোধ হয় মনে আছে, সেদিন যেদিকে গিয়েছিলুম, সেদিকটা নূতন। তার ওপর কম্পাসটাও সঙ্গে নিই নি, বনটাও গভীর। আন্দাজে গাঁখানার অবস্থিতি ঠিক করে জল থেকে উঠেই সেইদিক পানে তাড়াতাড়ি চল্‌তে লাগলুম। জলে ভাসবার সময় যে চীৎকার শুন্‌তে পেয়েছিলুম, সেটা ক্রমেই ক্ষীণ হয়ে আসছে। মনে হচ্ছে, তারা যেন ক্রমে দূরে সরে যাচ্ছে। হয়ত সেই গাঁয়েরই জংলীরা শিকারে বেরিয়ে থাকবে। চীৎকার করতে করতে কোন শিকারকে তাড়া করে নিয়ে চলেছে।

আমি আরো একটু তাড়াতাড়ি চল্‌তে লাগলুম। একে পোষাক-পরিচ্ছদ সব ভিজে, তার ওপর অস্ত্রের মধ্যে তীক্ষ্ণধার ছোরাখানি সম্বল। গুলি-বারুদ জলে ভিজে রাইফেলটাও কাজের বাইরে হয়ে গেল। সেটা দিয়ে বড় জোর লাঠির কাজ চল্‌তে পারে। হাত-ঘড়িটাও বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। বনের তলা থেকে সূর্য্যের মুখও দেখবার উপায় নেই। বেলা যে তখন কত এবং কতক্ষণ যে চলেছি, ঠিক করতে পারছিলুম না। আন্দাজে মনে হ'ল, অন্ততঃ ক্রোশ-খানেক চলে এসেছি, বেলাও অনেক হবে, কিন্তু বসতির কোন সন্ধান মিলল না!

মনে হ'ল, পথের ভুল হয়ে থাকবে। কেননা, জায়গাটার পাশে কয়েকটা জলা থাকবার কথা। তবুও আর খানিক অগ্রসর হলুম। তবুও জলাগুলোর চিহ্ন পর্য্যন্ত নেই। এবার সন্দেহটা মনে চেপে বস্‌ল—

নিশ্চয় দিক্ ভুল হয়েছে। দিক্ ঠিক করবার জন্যে তৎক্ষণাৎ একটা প্রকাণ্ড গাছের ওপর উঠে তার সবচেয়ে উঁচু ডাল থেকে চারদিকে তাকিয়ে দেখলুম। কিন্তু গাঢ় সবুজ বন ও চারদিকে কালো-কালো পাহাড় ছাড়া আর-কিছু চোখে পড়ল না!

সূর্য্যের অবস্থিতি দেখে অনেক চেষ্টার পর মনে হ'ল, গাঁয়ের সন্ধান পেয়েছি। একটু ধোঁয়াও যেন সেখান থেকে উঠে গাছপালার মাথায় ছড়িয়ে পড়ছে! বেলাও ঢলে পড়েছে। পেটে প্রবল খিদের আগুন। গাছ থেকে তাড়াতাড়ি নামতে লাগলুম, কিন্তু মাঝ-বরাবর এসে স্থির হ'তে হ'ল। নীচের দিকে তাকিয়ে দেখি, প্রকাণ্ড একজোড়া কালো ভালুক গাছটার নীচে ঘুরে-ফিরে কি যেন খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে! সম্ভবতঃ পোকা। আমার নড়া-চড়ায় ডাল-পালার শব্দে তারা ওপর-পানে ঘাড় তুলে তাকাল। কিন্তু আমার দিকে মনোযোগ না দিয়ে চট ক'রে একটা ঝোপের মধ্যে ঢুকে পড়ল।

তবুও আমার তখন গাছ থেকে নামতে ভরসা হ'ল না, যদি ফিরে আসে! প্রায় মিনিট-দশেক তাদের অপেক্ষায় গাছের ওপর বসে রইলুম, তারা ফিরে এল না। আমি আবার নাম্‌তে লাগলুম। মাটি থেকে হাত-কয়েক ওপরে পৌঁছে, গাছের একটা ডাল ধরে ঝুলে সবেমাত্র মাটিতে বাঁ-পাখানা ছুঁইয়েছি, অমনি একটি ভালুক ঝোপ থেকে ছুটে বেরিয়ে এল—তার পিছনে-পিছনেই প্রকাণ্ড এক চিতাবাঘ! রকম দেখে মনে হ'ল, দুটোতেই বেশ উত্তেজিত। বনে-বনে এতকাল ঘুরছি, কিন্তু বাঘ-ভালুকের লড়াই সেদিন ছাড়া আর কখনও দেখিনি। বলা বাহুল্য, আমি ততক্ষণে গাছের ওপর উঠে পড়েছি।

সমুখে কিছুদূরে একটা ঝোপ ছিল। ভালুকটা তার মধ্যে ঢুকে পড়বার আগেই চিতাবাঘটা হাঁক ছেড়ে তার ঘাড়ের ওপর লাফিয়ে পড়ল। ভালুকটাও চক্ষের পলকে ফিরে উঠে দাঁড়াল। থাবা চালাতে ভালুকও কম ক্ষিপ্র নয়। চিতাবাঘটা লক্ষ্যভ্রষ্টের মত একপাশে লাফিয়ে পড়েই ভালুকটার চোখে প্রচণ্ড এক থাবা মারলে। সে-আঘাতে ভালুকটার চোখ ও মুখের একপাশের মাংস ঝুলে পড়ল। চক্ষের পলকে ভালুকটার থাবায় চিতাবাঘটারও ঘাড়ের মাংস ও একটা কান ছিঁড়ে নেমে এল।

রাগে দুটোরই মুখ-চোখের চেহারা ভয়ঙ্কর! আঁচ্ড়া-আঁচ্ড়ি, কাম্ড়া-কাম্ড়ি ও ঘন-ঘন থাবার আঘাতে দুটোরই শরীর ক্ষত-বিক্ষত। মাটিতে, ঝোপের পাতায়, ডালে তাদের ক্ষত থেকে টস্-টস্ ক'রে রক্ত ঝরে পড়ছে! বাঘটা ভালুকটার ঘাড়ের ওপরে লাফিয়ে পড়বার চেষ্টা করতে লাগ্‌ল। ভালুকটাও বাঘটাকে বজ্র-আলিঙ্গনে পিযে ফেলবার চেষ্টা করছে। বাঘটা দূরে সরে যায়, মাটিতে ওৎ পেতে বসে, ভালুকটাও তখন দু'পায়ের ওপর উঠে দাঁড়ায়। কিন্তু কেউ কাউকে পরাস্ত করতে পারে না।

তবে মনে হ'ল, ভালুকটা যেন ক্রমে নিস্তেজ হয়ে পড়ছে। পালাবার দিকেই তার চেষ্টা দেখা যেতে লাগ্‌ল। একবার পালাবার চেষ্টাও করলে। ঠিক সেই মুহূর্তে বাঘটা তার ঘাড়ের ওপর লাফিয়ে পড়ে থাবার এক প্রচণ্ড আঘাতে তার মাথার খুলি ভেঙে ফেললে। ভালুকটা ধপ্ ক'রে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। বাঘটা কাম্ড়ে-কাম্ড়ে তার দেহের হাড়-গোড় মট্-মট্ ক'রে ভাঙতে লাগ্‌ল। তারপর এক লাফ দিয়ে ঝোপের মধ্যে ঢুকে পড়ল।

চিতাবাঘকে আমি একটুও গ্রাহ্যের মধ্যে আনি না। পূর্ব্বঘাট পর্ব্বতের এক অংশে কিছুকাল বাস করবার সময় আমার গোটা-পাঁচেক বুলডগ ছিল। তাদের নিয়ে আমি চারটি চিতাবাঘ শিকার করেছি কেবল ছোরা দিয়ে। কিন্তু আহত চিতা, মানুষ-খেকো বাঘের মতই ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। যা হোক্, আমি আর বিলম্ব না ক'রে গাছ থেকে নেমে গাঁয়ের দিকে রওনা হলুম।

এবারও চলেছি ত' চলেছি। এ বনের যেন কোথাও শেষ নাই। ছোট-ছোট জলাশয়গুলোরও দেখা পাই না। চারদিকে বিশাল তরুশ্রেণী, লতা-গুল্ম, কাঁটার বন ও নিবিড় ঝোপ। দশ হাত দূরে কি আছে জানবার উপায় নেই। আবার পথের ভুল হ'ল! কিন্তু দেখলুম যেন সমুখে একসার পহাড় উঠেছে! হয়ত' ঘোরা-পথে গাঁয়ের কাছে এসে থাকব ভেবে সেই পাহাড়-সারির দিকেই তাড়াতাড়ি চলতে লাগলুম। প্রায় মাইল-খানেক চলবার পর বনটা পাতলা হয়ে হঠাৎ এক জায়গায় শেষ হ'ল। সেখানে সাম্‌নেই দেখি সেই পাহাড়ের সারি, তার তলায় প্রায় শ'তুই হরিণ চরে বেড়াচ্ছে। কোথায়-বা গাঁ, আর কোথায়-বা মানুষের চিহ্ন।

এদিকে সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। ভিজে পোষাকগুলো তখনও শুকোয়নি। পেটে খিদের জ্বালা, শরীর ক্লান্ত। তার ওপর অস্ত্রহীন। এখনই নানারকম হিংস্র প্রাণী বেরিয়ে পড়বে। কথাটা ভাবতে-ভাবতেই সমুখে একপাল শূকর ঘোঁৎ-ঘোঁৎ ক'রে বেরিয়ে পড়ল। তাদের এক-একটা যেন হাতীর বাচ্চা! নীচে দাঁড়িয়ে থাকা নিরাপদ নয়। শূকরগুলোরও সেখান থেকে তৎক্ষণাৎ চলে যাবার লক্ষণ দেখা গেল না। আমি তাদের অলক্ষ্যে গাছে চড়ে

বসলুম, তারা চারধারের গাছ-পালার শিকড় খুঁড়ে খেতে লাগ্‌ল।

বনটা যেখানে শেষ হয়েছে, সেখান থেকে একখানা মাঠ আরম্ভ। মাঠের ওধারে আবার ছোট-ছোট ঝোপ-ঝাড়; সেগুলো একেবারে পাহাড়-সারির গায়ে মাথায় উঠে গেছে। গাছ থেকে দেখলুম, সেই ঝোপগুলোর কয়েকটা একটু নড়ছে, তারপরই ঝোপের মধ্য থেকে গোটা-দশ-বারো হায়েনা বার হয়ে শূকরগুলোর দিকে আসতে লাগ্‌ল। শূকরগুলো তাদের গায়ের গন্ধ পেয়ে ফিরে দাঁড়াল। কিন্তু দুই দলে যুদ্ধ হবার আগেই শূকরগুলো বনের মধ্যে সরে পড়ল। হায়েনার দলও ঝোপের আড়ালে গা ঢাকা দিলে। পাহাড়গুলোর দিকে তাকিয়ে দেখলুম—হরিণের পালও আর দেখা যায় না। অন্ধকার আরও যেন গাঢ় হয়ে এসেছে। আমার মনের ওপরে বনের সেই গাম্ভীর্য্য গভীর ভাবে চেপে বসল। আমি গাছের ডাল আঁক্‌ড়ে ধরে অন্ধকারে চোখ দুটো ডুবিয়ে চুপ ক'রে বসে রইলুম।

দূরে-দূরে ফেউ ডাকছে, হায়েনার অট্টহাসি শোনা যায়। মাঝে মাঝে চিতা বাঘের 'মিউ-মিউ' কানে আস্‌তে লাগ্‌ল। দু'-একবার গাছের তলা দিয়ে কি যেন ছুটে গেল। কিন্তু আমি তাদের সকলের পাল্লার ওপরে। প্রায় ঘণ্টাখানেক এমনিভাবে বসে থাকবার পর যেন দেখতে পেলুম, গাছের গোড়ায় অন্ধকারের মধ্যে দুটো আগুনের টুকরো! বোধহয় মিনিট-দুই সেটা সেইভাবে থেকে অন্ধকারে ডুবে গেল। কিন্তু তারপরই মনে হ'ল, গাছটা একটু-একটু দুলছে, একটা কি যেন খুব সন্তর্পণে ওপরে উঠে আসছে। আমিও তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে গাছের গুঁড়ির দিকে তাকিয়ে রইলুম।

বেশীক্ষণ অপেক্ষাও করতে হ'ল না, সেই আগুনের টুক্‌রো দুটো গুঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে এসে এক জায়গায় স্থির হয়ে রইলো। আমি যে-ডালে বসেছিলুম, জায়গাটা সেখান থেকে হাত-আট-দশ নীচে হবে। তারপর সেটা আবার আস্তে-আস্তে আমার দিকে উঠে আসতে লাগ্‌ল।

আপনারা কালো বাঘের কথা শুনেছেন। এরা গাছে চড়তে ওস্তাদ। শিকারের আশায় গাছের ডালে লুকিয়ে বসে থাকে। নীচে দিয়ে কেউ গেলে তার ঘাড়ের ওপর লাফিয়ে পড়ে, নখ ও দাঁত দিয়ে টুঁটি ছেঁড়ে ও চোখ দুটো উপড়ে ফেলে। অবশ্য একবার মনে হ'ল, হয়ত' বনবেড়াল! কিন্তু তাহ'লে সেটা আমাকে লক্ষ্য ক'রে এমনভাবে উঠে আসবে কেন? চিতাবাঘও নয়। তবে?

ইতিমধ্যে সেটা আমার সমুখে হাত-চার-পাঁচের মধ্যে এসে পড়ল। এবার তার চোখ দুটো আরও তীব্র হয়ে জ্বলছে, জন্তুটা রাগে গর্‌-গর্‌ করছে। পিছনে যে সরে যাব, তারও উপায় নেই। ডালটা আর মাত্র হাত-পাঁচ-ছয় লম্বা। এখনি আমাদের দু'জনের ভারে নুয়ে পড়েছে।

কোমর থেকে ছোরাখানা খুলে তবুও হাত-দুই সরে গেলুম। সেটাও তাড়াতাড়ি আরও কাছে এগিয়ে এল। তারপর হাঁক ছেড়ে থাবা চালালে। সৌভাগ্যবশতঃ তার নড়া-চড়ায় ডালটা নুয়ে পড়ল, থাবাটা আমার গালে না লেগে, কাঁধে লেগে খানিকটা মাংস ছিঁড়ে গেল। স্থির হয়ে বসে থাকলে সে আমায় জীবিত রাখবে না। আমিও এক বিকট হাঁক ছেড়ে তার চোখ দুটো লক্ষ্য ক'রে ছোরা চালালুম। বোধহয়, ছোরাখানা তার কপালে বসে গেল।

কিন্তু সেখানা খুলে নেবার আগেই আমার কব্জিতে তার একখানি থাবা এসে সুতীক্ষ্ণ নখ বসিয়ে দিলে। সে আঘাতে মনে হ'ল, হাত থেকে কব্জিটা যেন ছিঁড়ে গেল।

বাঁ-হাতে ডাল ধরে আছি। ডান-হাতখানার দু' জায়গায় জখম হয়ে অনবরত রক্ত ঝরছে। বাঘটা ভয়ঙ্কর উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। যে অস্ত্রখানি সম্বল ছিল, সেখানিও তার কপালে গাঁথা। টেনে নেবারও উপায় নেই। কিন্তু চট্ ক'রে মনে পড়ল, আমার পিঠে শ্লিংয়ে রাইফেল বাঁধা। ডালটাকে দুটো উরু দিয়ে শক্ত ক'রে চেপে ধরে, ক্ষিপ্র হাতে রাইফেলটাকে খুলে নিলুম এবং যথাসম্ভব জোরে বাঁট দিয়ে বাঘটার চোখ দুটোর ওপর আঘাত করলুম। সেই আঘাতে বাঘটা পড়ল না, কিন্তু আমি ঝোঁক সামলাতে না পেরে, সেই হাত-পনেরো উঁচু ডাল থেকে নীচে একটা ঝোপের ওপর পড়ে গেলুম।

বাঘটা তৎক্ষণাৎ আমার পাশে লাফিয়ে পড়ল। কাঁটায় আমার হাত-পা, মুখ ক্ষত-বিক্ষত। ক্ষতগুলোয় অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছে। ঝোপটা খুব ঘন থাকায় পড়ার বেগে কেবল কোমরেই কিছু চোট লাগ্‌ল। কিন্তু প্রাণরক্ষার তুলনায় সে-সব তুচ্ছ!

অন্ধকার ভীষণ বন। কাছে মানুষের বসতি নেই। তবে একটা বড় আশ্চর্য্যের কথা এই যে, বাঘটা আমার পাশে পড়েও আমাকে আক্রমণ করলে না। তবুও আমি সেখান থেকে উঠে রাইফেলটা হাতে নিয়ে সেই মাঠের দিকে ছুট্‌লুম। পিছনে বাঘটাও আসছে কিনা বুঝতে পারলুম না! আর, তখন তা' বুঝবার মত অবস্থাও নয়।

কতদূর গিয়ে মাঠের ওপারে একটা আলো দেখতে পেলুম। কিন্তু তা'-ও বহুদূরে। তবুও গায়ে বল, মনে সাহস এল প্রচুর। সেটাকেই লক্ষ্য ক'রে ছুট্‌তে লাগলুম। আলোটা এক-একবার জ্বলে, আবার নিবে যায়। আবার কিছুক্ষণ স্থির হয়ে জ্বলতে থাকে। ক্রমে সেটা বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠ্‌ল। আরও খানিক গিয়ে দেখতে পেলুম, তার চার-দিকে কারা যেন চঞ্চল হয়ে ঘোরাঘুরি করছে! প্রত্যেকের হাতে তীর-ধনুক।

তখন আমি ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত। আর ছুট্‌তে পারি না। যারাই হোক্, ওদের কাছেই রাতের মত আশ্রয় চাইব। চল্‌তে-চল্‌তে একবার স্থির হয়ে দাঁড়ালুম। কান ও চোখ দুটো যথাসম্ভব তীক্ষ্ণ ক'রে চারদিকে তাকিয়ে দেখলুম। কিন্তু কোন জন্তু-জানোয়ারের হাঁকাহাঁকি শুনতে, বা কিছু দেখতে পেলুম না। হঠাৎ সেই লোকগুলো ভয়ঙ্কর চীৎকার ক'রে, আগুনের চারধারে বসে পড়ল।

শুনেছিলুম, এই অঞ্চলে সময়ে-সময়ে রাক্ষুসে জংলীর দল ঘুরতে-ঘুরতে আসে। এরা খায় না এমন জিনিস নেই। এদের দেবতার কাছে মানুষ পর্য্যন্ত বলি দিয়ে থাকে। এই জংলীরা কি তারাই? তাহ'লে ত' সর্ব্বনাশ! বাঘের হাত থেকে বাঁচা সম্ভব হ'লেও, এদের হাত থেকে নিস্তার নেই যে! এদিকে ক্ষুধাতৃষ্ণায়, পরিশ্রমে ও রক্তমোক্ষণে আমার শরীর অবসন্ন। হয়ত' এরা সে-রকম না-ও হ'তে পারে ভেবে আস্তে, আস্তে, এগিয়ে যেতে লাগলুম। কাছে গিয়ে একটা ঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখলুম, জংলীরা আগুনের চারধারে বসে দুটো প্রকাণ্ড হরিণকে ছাড়িয়ে নিয়ে, আগুনে পুড়িয়ে খেতে সুরু করেছে। তাদের পরণে কৌপীন।

মাথায় ঝাঁকড়া চুল। গায়ের রং কালো। শরীর বেশ বলিষ্ঠ। প্রত্যেকের পাশে তীর-ধনুক পড়ে।

মনে পড়ে গেল, ছুপুরে এই জলার মধ্য থেকে যাদের চীৎকার শুনেছিলুম তাদের! এরা হয়ত' সেই শিকারীর দল! সাহসে ভর ক'রে ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে আস্তে-আস্তে তাদের সাম্‌নে গিয়ে দাঁড়ালুম। প্রথমে সকলে আমাকে দেখে অবাক্। কিন্তু নিমেষে সে ভাব কেটে গেল। সকলে লাফিয়ে উঠে তীর-ধনুক হাতে নিয়ে দাঁড়াল। কিন্তু আমি তাদের শত্রু নই! আমার ক্ষত-বিক্ষত হাতখানা তাদের সাম্‌নে বাড়িয়ে দিলুম। একজন তার ওপর ঝুঁকে খুব ভাল ক'রে ক্ষতগুলো পরীক্ষা করলে। তারপর তার হুকুমে একজন মাটির ভাঁড়ে জল নিয়ে আসতেই সে বিড়্‌বিড়্ ক'রে বোধহয় মন্ত্র পড়তে-পড়তে তার ওপর ঠাণ্ডা জল ছিটাতে লাগ্‌ল। তাতে জমাট রক্ত ধুয়ে গেল বটে, কিন্তু অসহ্য যন্ত্রণা সুরু হ'ল।

আমি এতক্ষণ আর কোনদিকে লক্ষ্য করিনি। হাত ধোয়া হয়ে গেলে দেখি, একটা জংলী তাড়াতাড়ি ছুটো পাথরে কিসের কাঁচা পাতা ছেঁচছে! পাতাগুলো ছেঁচা হয়ে গেলে আমার হাতে, কাঁধে ও যে-যে জায়গায় ছিঁড়ে ছড়ে, কেটে গিয়েছিল, সেই জায়গায় বেশ পুরু ক'রে লাগিয়ে দিলে। হ্যাভারসাকের মধ্যে পরিষ্কার ন্যাক্‌ড়া ছিল। আমি তা' বার ক'রে দিলে, সেই জংলীটাই খুব বড়-বড় শালপাতা দিয়ে সেটা জড়িয়ে দিলে। সেই পাতার গুণে কিছুক্ষণের মধ্যেই আমার অসহ্য জ্বালা-যন্ত্রণা কমে গেল। আমি তাদের সঙ্গে বসে হরিণের মাংস-পোড়া ও ঝরণার শীতল জল খেয়ে সুস্থ হলুম।

আমাদের কথা-বার্ত্তা আকারে-ইঙ্গিতে চল্‌ছিল। আন্দাজে বুঝলুম, এই জংলীরা পাহাড়ে-পাহাড়ে ঘুরে বেড়ায়। এদের বাড়ী-ঘর কিছু নেই। সেদিন ঐ পাহাড়ের নীচে শিকারে এসে একটা হরিণের পালের পিছনে ধাওয়া করে। পরদিন তারা আবার পাহাড়ে ফিরে যাবে। যা হোক্, রাতখানার মত ত' তাদের আশ্রয় পাওয়া গেল!

কিন্তু পরদিন যাবার সময় তারা আমাকে ছাড়লে না। আমারও প্রবল জ্বর এসেছে। দু'পা উঠে চলবারও সামর্থ্য নেই। দু'জনে আমাকে কাঁধে তুলে নিলে। তখন পর্য্যন্ত আমার জ্ঞান ছিল, তারপর কি হয়েছিল জানি না।

জ্ঞান হ'তে তাকিয়ে দেখি, একটা অন্ধকার ও দুর্গন্ধযুক্ত গুহার মধ্যে আমি পড়ে আছি। কিন্তু কতদিন. পরে জ্ঞান হ'ল, বুঝতে পারলুম না। হাতের ব্যথা অনেক কম। জ্বরও নেই। মাথার কাছে এক ভাঁড় জল ও খানিকটা পচা মাংস। গুহাটার ভেতর থেকে শন্‌-শন্‌ শব্দ হচ্ছে। বড় আশ্চর্য্য বোধ হ'তে লাগ্‌ল।

তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াতে গিয়ে শরীরটা বড় হাল্কা ও দুর্ব্বল বোধ হ'ল। গুহার ভেতর থেকে আস্তে-আস্তে বাইরে এসে দাঁড়াল্‌ুম। চোখ দুটো সূর্য্যের আলোয় কর্‌-কর্‌ ক'রে উঠ্‌ল! মনে হ'ল, আমার অবস্থা কি রিপ্‌ ভ্যান উইংকিলের মত? সেই জংলীরা—মানুষ না ভূত? কত বছর ধরে আমি এই গুহার মধ্যে ঘুমিয়েছি? দাড়িতে হাত দিয়ে, মাথার চুল টেনে দেখল্‌ুম বেশী বড় হয়নি। কাঁচাও আছে! আমার রাইফেল ও টোটার বেল্টটা গুহার মুখে রৌদ্রে পড়ে। রাইফেলের চোঙ্গে মরচে ধরেছে বটে, কিন্তু বিশেষ কিছু

নয়। খুলে দেখলুম, একটা গুলি তখনও আছে। রাইফেলের চোঙ্গটা গুহার দিকে ফিরিয়ে পরীক্ষা করবার জন্য ট্রিগারটা টিপতেই সশব্দে গুলিটা বেরিয়ে গেল। অমনি ফড়্-ফড়্ শব্দে তার মধ্য থেকে বেরিয়ে এল একপাল চামচিকে। কিন্তু সেই একটানা শব্দ থামল না।

পর-পর আরও দুটো গুলি ছাড়লুম। কয়দিন অনবরত রৌদ্র পাওয়ায় বারুদ শুকিয়ে গিয়েছিল বলে দুটোতেই আগুন ধরল। চারদিকে হ্যাভারসাকটা খুঁজলুম; কিন্তু কোথাও সেটা পেলুম না। জংলীদেরও কোন চিহ্ন নেই। গুহার মুখ থেকে কিছুদূরে পোড়া-ডালপালা ও হাড়গোড় পড়ে আছে। ছাইয়ের অবস্থা দেখে আন্দাজ করলুম, তারা পাঁচ-ছয় দিন আগেও ছিল। কিন্তু আমি ক'দিন অজ্ঞান হয়েছিলুম? আমাকে একলা ফেলেই বা তারা চলে গেল কেন? অনেক ভেবে কোন উত্তর পেলুম না। তারা যাবার সময় আমার হ্যাভারসাকটা যে নিয়ে গেছে, এতে আর কোন সন্দেহ রইল না।

আমি আস্তে-আস্তে পাহাড় থেকে নামতে লাগলুম। নামতে নামতে দেখলুম, একটা বেশ বড় ঝরণা ওদিকে আর-একটা পাহাড়ের গা থেকে নেমে এই পাহাড়টার গায়ে পড়েছে। বোধহয় সেখানে গুহার আর-এক মুখ। তার মধ্যে দিয়ে ঢুকে ঝরণাটা আর একদিকে বার হচ্ছে। তারই চলার শন্-শন্ শব্দ শোনা যাচ্ছিল। আমি অতি কষ্টে সেই ঝরণাটার ধারে গিয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করলুম। তারপর এক ঢোক জল খেয়ে পাহাড় থেকে নামলুম। কিন্তু যাব কোন্ দিকে?

সেই গাঁ থেকে ক'দিনের দূরের পথে এসেছি, তাও জানি না।

শরীরও বড় তুর্ব্বল। একদিন বার হয়েছিলুম, তারপর ক'দিন কেটে গেল, কে বলে দেবে? আন্দাজে একটা দিক্ ঠিক ক'রে, সেদিক্ পানে ক্রমাগত চল্‌তে লাগলুম। চারদিকে গভীর বন। খিদে পেলে, পাখী শিকার করি। পাথরে-পাথরে ঘসে বারুদের আগুনে শুকনো পাতা জ্বালাই, তাতে মাংস পুড়িয়ে খেয়ে কোনরূপে ক্ষুধা দূর করি, রাতের বেলায় গাছে চড়ে বসি, কেবল দিনের আলোয় চলি। পথে আবার তু'দিন বাঘের সমুখে পড়লুম। একদিন হায়েনার দল তাড়া করলে। কিন্তু হাতে তখন বন্দুক। তুটো হায়েনা মারা পড়তেই তারা পালিয়ে গেল।

এমনি ক'রে পাঁচদিন ক্রমাগত উত্তর দিকে চলে একদিন শেষবেলায় সেই জলাগুলোর সন্ধান পেলুম। তখন মনে যে কি আনন্দ হ'ল, তা' আপনারা সহজে অনুমান করতে পারবেন না। ঐ জলার ধারেই আমি গণ্ডারের সমুখে পড়ি; আর, ঐখান থেকেই চল্‌তে-চল্‌তে গিয়ে পড়ি গহন বনে। তারপর আমার যা তুরবস্থা হয়েছিল, আপনারা এতক্ষণ শুনলেন।

সেই জলার ধার দিয়ে তাড়াতাড়ি চলে সন্ধ্যেবেলায় আমি গাঁয়ে এসে পৌঁছলুম। আমাকে দেখে সকলের কি আনন্দ!

সর্দ্দার বল্লে, তারা আমাকে নানাদিকে খুঁজেছে; একটা জলার ধারে আমার পায়ের দাগও দেখেছিল। সেখান থেকে ক্রোশ-কয়েক দূরে একটা গাছের তলায় একটা কালো মরা বাঘের কপালে একখানা ছোরা দেখে আন্দাজ করেছিল, এ আমারই কাণ্ড। কিন্তু আমি গেলুম কোথায়? এত খোঁজাখুঁজি ক'রেও আমাকে না দেখে, তাদের ধারণা হয়েছিল, আমি মারা গেছি।

সর্দ্দার তৎক্ষণাৎ আমার স্নান ও খাবার যোগাড় ক'রে দিলে। আমি স্নান ক'রে, পেট ভরে খেয়ে আমার পূর্ব্বের আস্তানাটিতে গিয়ে খাটিয়ায় শুয়ে পড়লুম। ক্লান্ত শরীর বলে ঘুমও এল তৎক্ষণাৎ। তারপর, কিছুদিনের মধ্যেই শরীর বেশ সুস্থ হ'ল। আগের শক্তি ও তেজ ফিরে পেলুম। আবার শিকারে বার হই এবং তার মাসখানেক পরেই একদিন—"কিন্তু ঐ দেখুন, পূর্বদিক্ ফর্সা হয়ে এসেছে। পাখীর ডাক শোনা যাচ্ছে—" বলে মিঃ ফরেষ্টার চুপ করলেন।

মিঃ ব্রেকার ও ধীরেনবাবু তাঁবুর পর্দ্দার ফাঁক দিয়ে দেখলেন, পূবে পাহাড়টার পিছনের আকাশ পরিষ্কার—তার কোথাও একটি তারা কি একটু অন্ধকার নেই।

বাবুর্চ্চিরা আগেই উঠেছিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা তাঁদের সাম্‌নে গরম খানা হাজির করলে। তাঁরা খেতে-খেতেই চারদিক্ বেশ ফর্সা হয়ে এল। খাওয়া-দাওয়া শেষ ক'রে পিঠে রাইফেল ও কোমরে ছোরা বেঁধে ঘোড়ার পিঠে উঠে রাতের সেই বাঘটাকে শিকার করতে তিনজনে বনের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

দূর থেকে তাঁদের ঘোড়ার খুরের শব্দ শোনা যেতে লাগ্‌ল। শেষে তা'-ও আর শোনা গেল না, চোখের সাম্‌নে জেগে রইল কেবল বড়্‌কার্গাওয়ের গভীর বন ও তার পিছনে কালো পাহাড়ের সারি!

সমাপ্ত